সরল ন্যায়

শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশ ১৩৫৭ চৈত্র

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীসত্যপ্রসন্ন দত্ত
পূর্ব্বাশা লিমিটেড, পি ১৩ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা

৩·১

প্রমেয় প্রকরণ

দর্শনশাস্ত্র কি

সুখ ও দুঃখ সকলের অনুভবসিদ্ধ। উহারাই সকল প্রকার চেষ্টার মূল। যাহা সুখেব উপায় লোক তাহা সংগ্রহ করিতে চায়। যাহা দুঃখপ্রদ তাহা পরিহারের জন্য প্রাণিগণ চেষ্টা করে। যদি সুখ ও দুঃখ বলিয়া কোনও বস্তু না থাকিত কিংবা সুখের প্রাপ্তি অথবা দুঃখের নিবৃত্তি সাধ্যাতীত হইত তবে কেহ কোনও কার্যে প্রবৃত্ত হইত না।

সুখের স্বরূপ এমনই অপূর্ব যে জ্ঞান হওয়া মাত্রই 'উহা আমার হউক' এইরূপ ইচ্ছা জন্মে। তাই সুখ সর্বদা সকলেব ইষ্ট অর্থাৎ ইচ্ছার বিষয়। দুঃখের স্বরূপেও বৈশিষ্ট্য আছে। যে-কেহ একবার দুঃখ অনুভব করিয়াছে সে-ই চাহে ইহা (দুঃখ) আমার না হউক। এজন্য দুঃখ স্বভাবতই দ্বিষ্ট বা দ্বেষের বিষয়। দুঃখ স্বভাবতঃ দ্বিষ্ট এই কারণে উহার অভাব অর্থাৎ দুঃখনিবৃত্তি সকলের কাম্য বা ইষ্ট। ইষ্ট বলিয়া গণ্য হইলেও সুখ ও দুঃখনিবৃত্তি অভিন্ন নহে। শুষ্ক কাষ্ঠ পাষাণ প্রভৃতি অচেতন বস্তুগুলি দুঃখশূন্য, তথাপি কেহ ঐগুলিকে সুখী মনে করে না। উক্ত কারণেই সুখের অভাবও দুঃখ সংজ্ঞায় নির্দেশের অযোগ্য।

অচেতনক্ষেত্রে সুখ এবং দুঃখাভাবের ভেদ যেমন স্পষ্ট চেতন প্রাণিসমূহ বিশেষতঃ মনুষ্যলোকের নিকটে উহা সেরূপ স্পষ্ট নহে। এজন্য অনেক স্থলে দুঃখের অভাবই সুখ বলিয়া প্রতীত হয়। দুর্বহ ভার অপসারিত হইলে 'লোকটি সুখী হইল' এইরূপ ব্যবহারের কথা অনেক গ্রন্থেও দেখা যায়। ভার নামিয়া গেলে কিন্তু দুঃখেরই

উপশম হয়। সুখ ও দুঃখনিবৃত্তি স্বতন্ত্র দুইটি পদার্থ ইহাই বহুসম্মত সিদ্ধান্ত এবং সমস্ত কার্যের উহারাই চরম ফল বা মুখ্য প্রয়োজন। অন্য যাহা-কিছু প্রয়োজন বলিয়া ব্যবহৃত হয় ঐ দুইটি মুখ্য প্রয়োজনের উপায় বলিয়াই তাহার প্রয়োজনত্ব সিদ্ধ হয়। সুতরাং সে সমুদায় গৌণ প্রয়োজন।

সুখ এবং দুঃখনিবৃত্তিই দর্শনশাস্ত্রসমূহেব প্রধান আলোচনাবিষয়। ঐবিষয়ে যেসকল প্রশ্ন উদিত হয় দার্শনিকগণ তাহার সমাধানের জন্য নানা পথ অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। তাহাদের চিন্তাব ফলে যে বিপুলায়তন দর্শনশাস্ত্রসমূহ রচিত হইয়াছে ন্যাযদর্শন তাহাদের অন্যতম। আজ হইতে কতকাল পূর্বে মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্রসমূহ রচনা করিয়াছিলেন তাহা স্থিব করা কঠিন। তবে এইসূত্রসমূহ যে অতি প্রাচীন এবং ন্যায়শাস্ত্রের আদিগ্রন্থ তাহা নিঃসন্দেহ।

সুখ বা দুঃখনিবৃত্তিব সম্পাদনে উপযোগী নহে এমন বস্তু কল্পনা করাও কঠিন। সুতরাং মুখ্য প্রয়োজন দুইটির কাবণ আলোচনায় যাহারা প্রবৃত্ত, জাগতিক সমস্ত পদার্থ, এমন কি যদি ইহার বাহিরে কিছু থাকে তাহাও, তাহাদিগের আলোচনাব বহির্ভূত বলা যায় না। তাই দার্শনিক আলোচনায় সকল বিষয়ই স্থান পাইবার যোগ্য। তথাপি সকল শাস্ত্রকেই দর্শনশ্রেণীর মধ্যে গণনা করা হয় না। সুখ ও দুঃখের আশ্রয় কি, উহাদের স্থায়িত্ব কতকাল, উহাদিগের একটিকে একান্তভাবে পরিহার করিয়া অন্যের একাধিপত্য সম্ভব কি না, কে উহাদিগেব ভোক্তা, কেমন করিয়াই বা সেই ভোগ নিষ্পন্ন হয় প্রধানতঃ এই সকল যে শাস্ত্রের আলোচ্য তাহাই দর্শনশাস্ত্র বলিয়া পবিগণিত।

দর্শন পদের অর্থ

দৃশ্‌ ধাতুর অর্থ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, চোখে-দেখা। এই ধাতুর উত্তরে করণ বাচ্যে অনট্‌-প্রত্যয় দ্বারা 'দর্শন' শব্দ সাধিত হয়। তাহাতে

দর্শন-পদের অর্থ হয় চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের করণ। জ্ঞান সমূহের মধ্যে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ এবং তাহার করণ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের স্থান বিশেষ উচ্চ। জ্ঞাতব্য বিষয়ে বহুপ্রকার সংশযের নিরাস চক্ষুর দ্বারাই হইয়া থাকে। নিঃশয় জ্ঞানই দৃঢ়তা জন্মায়। এই দৃঢতা অর্থাৎ নির্ভবযোগ্যতা বশতঃই কার্যে প্রবৃত্তি জন্মে।

শাস্ত্র শব্দসমষ্টিমাত্র। উহা হইতে যে-জ্ঞান জন্মে তাহা শাব্দবোধ, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ নহে।

দর্শনশাস্ত্র হইতে উৎপন্ন জ্ঞানসমূহ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষেব মতই নির্ভব-যোগ্য। স্বর্গ নবক মুক্তি প্রভৃতি দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলিব প্রভাব লোকসমাজে অতিশয অধিক। প্রত্যক্ষসিদ্ধ সুখকব শয্যাদি ত্যাগ কবিয়া শীতের প্রত্যূষে ধর্মার্থ প্রাতঃস্নানে, অতিকঠোব সংযম ব্রত উপবাস প্রভৃতি নানাবিধ কার্যে অগণিত লোকের প্রবৃত্তি কে অস্বীকাব কবিতে পাবে? সুদৃঢ যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দর্শনশাস্ত্র যে নির্ভর-যোগ্যতা সৃষ্টি করিযাছে লৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ততদূব পরিয়াছে কি না সন্দেহ।

তাই 'কলিঙ্গো ব্যাঘ্রঃ' (অর্থাৎ কলিঙ্গ দেশীয় পুরুষটি ব্যাঘ্র) এইরূপ স্থলে ব্যাঘ্র-শব্দ যেমন গৌণী-লক্ষণা বশতঃ 'ব্যাঘ্র-সদৃশ' এইপ্রকার অর্থ বুঝাইয়া বক্তাব উদ্দেশ্য সিদ্ধি কবে, প্রকৃত ক্ষেত্রে দর্শন-শব্দও সেইরূপ গৌণী-লক্ষণা দ্বারা সামাজিক প্রত্যক্ষের অতীত বিষযসমূহে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান উৎপাদন করায় শাস্ত্রের দর্শন-সংজ্ঞা সার্থক হইযাছে।

দর্শন-শব্দ ভাব বাচ্যে অনট্-প্রত্যয সাধিত হইলে উহার অর্থ হয় চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বা দৃষ্টি। ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়সমূহেও মনীষীদিগের বিভিন্ন জ্ঞান ও মতবাদ সেই ব্যক্তির দর্শন ও দৃষ্টি বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপনিষৎ-শাস্ত্র হইতে যে সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় তাহাও ঔপনিষদ দর্শন বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে।

শাস্ত্রের ন্যায়-সংজ্ঞা কেন ?

বর্তমান প্রবন্ধে পদার্থসকল যে প্রকারে আলোচিত হইবে এই আলোচনাপদ্ধতি বৈশেষিক সম্মত, তবে এইসকল পদার্থ নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ও মানিয়া থাকেন। শাস্ত্র-শব্দের অর্থ উপদেশ। অন্যকে বুঝাইয়া স্বমতে আনয়ন কবিতে পারিলেই উপদেশ সার্থক হয়। ইহাই শাস্ত্রের শাস্ত্রত্ব। উপদেশ পরার্থ অনুমান। এই বিষয়ে পরে বলা হইবে। পরার্থ অনুমানে ন্যায় অর্থাৎ যথাক্রমে প্রযুক্ত প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ বাক্য আবশ্যক। প্রতিপাদ্য বিষয় সমুদায়ের মধ্যে এই বিশেষ বিষয় অনুসারেই শাস্ত্রের নাম ন্যায়দর্শন।

স্বপক্ষের জয় এবং বিপক্ষের পবাজয় সকলেরই কাম্য। জয়-পরাজয় ইত্যাদি অভিলষিত বস্তু যাহার সাহায্যে নীত অর্থাৎ ঠিক মত প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই ন্যায়। ন্যায়-শব্দের এই ব্যুৎপত্তিও হইতে পারে। ন্যায়বিদ্যা সমস্ত শাস্ত্রের প্রদীপ, সকল ধর্মের আশ্রয় এবং যাবতীয় কার্যের উপায় বলিয়া প্রাচীনদিগের প্রশংসিত।

আস্তিক ও নাস্তিক

দর্শনশাস্ত্রগুলিকে আস্তিক ও নাস্তিক ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। কোন্ দর্শন আস্তিক শ্রেণীর অন্তর্গত আর কোন্‌টি নাস্তিক শ্রেণীতে পরিগণিত হইবে তাহা নির্ভর করে আস্তিক ও নাস্তিক শব্দ দুইটির অর্থের উপরে। প্রামাণিক অভিধানকার অমরসিংহের মতে যাহারা মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন তাহারাই নাস্তিক। এই পরিভাষা অনুসারে যিনি যে মতবাদে বিশ্বাসী উহার বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণকারী সকলেই তাঁহার নিকটে নাস্তিক সংজ্ঞার যোগ্য। কারণ, ঐ প্রকার বিরুদ্ধমত তিনি সত্য বলিয়া মনে করেন না।

অস্‌-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন অস্তি-পদেব সমানার্থ 'অস্তি' এবং 'ন+অস্তি' এই তুইটি পদের মিলিত অর্থের ('নাই' এইরূপ) বোধক 'নাস্তি' এইরূপ এক-একটি অব্যয় শব্দও ব্যাকরণে স্বীকৃত হইয়াছে। উহাদেব উত্তর 'অস্তি নাস্তি দিষ্টং মতিঃ' এই পাণিনিসূত্রানুসারে ঠক্‌-প্রত্যয় দ্বারা আস্তিক ও নাস্তিক পদ সাধিত হয়। সুতবাং 'অস্তি' ও 'নাস্তি' শব্দেব নিত্য সাকাঙ্ক্ষ অর্থাৎ কর্তৃপদ কি তাহা স্থিব হইলেই ঐ শব্দ তুইটির অর্থ নিঃসংশয়ে বুঝা যায়। উল্লিখিত সূত্রেব প্রাচীন প্রসিদ্ধ বৃত্তি কাশিকাকাবেব মতে ঐ স্থলে কর্তৃপদ 'পবলোক'। এই মতে 'পরলোক আছে' এই প্রকাব মতিসম্পন্ন আস্তিক এবং 'পরলোক নাই' এইরূপ মতাবলম্বী নাস্তিক। বৃত্তিকার 'পরলোক' পদ অবলম্বনে সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিন্তু উহাব পরিবর্তে 'ঈশ্বর' পদ গ্রহণেও কোনও বাধা দেখা যায় না। তাহা হইলে ঈশ্ববেব অস্তিত্বে বিশ্বাসীরা আস্তিক এবং ঐ বিষয়ে অবিশ্বাসীরা নাস্তিক, ঐ শব্দ তুইটির এই অর্থ দাঁড়ায়। এই অর্থে ঐ তুই শব্দেব প্রয়োগও প্রচুর।

পবলোক মানিলেই ঈশ্বরেব অস্তিত্ব স্বীকৃত হইল ইহা বলা যায় না। সাংখ্য ও মীমাংসকেরা পরলোক স্বীকাব করেন, তথাপি উহাদিগের সম্প্রদায় বিশেষের নিকটে প্রমাণাভাবে ঈশ্বর অসিদ্ধ। সাংখ্য ও মীমাংসা আস্তিক দর্শন বলিয়াই প্রসিদ্ধ এবং বৃত্তিকারের ব্যাখ্যানুসারে তাহা উপপন্নও হয়।

অনেক স্থলে বেদবিরোধী বা বেদনিন্দকদিগকে নাস্তিক বলা হইয়াছে। নাস্তিক শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে ঐ রূপ অর্থ পাওয়া যায় না। পরলোক ও ঈশ্বর বিষয়ে প্রধান প্রমাণ বেদশাস্ত্র। বেদের প্রতিপাদ্য যজ্ঞাদি ক্রিয়া এবং মুক্তি উক্ত তুই বিষয়ের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে। পরলোক এবং ঈশ্বর স্বীকার না করিলে বেদের সার্থকতা থাকে না।

সুতরাং যাহারা বেদবিরোধী তাহারা বস্তুতঃ ঈশ্বর ও পরলোক বিরোধী বলিয়াই নাস্তিক সংজ্ঞায় উল্লিখিত হইতে পারেন।

ন্যায়দর্শন আস্তিকদর্শনসমূহের অন্তর্ভূত। ঈশ্বর এবং পরলোক উভয়ই ন্যায়দর্শনে স্বীকৃত। পবলোক অর্থে স্বর্গ ও নরক প্রসিদ্ধ। স্থূল দেহ হইতে অতিবিক্ত আত্মাব অস্তিত্ব না মানিলে স্বর্গ বা নরক উপপন্ন হয় না। মৃত্যুর পরে স্থূলদেহ ভস্মীভূত করা হয়। ভূগর্ভে প্রোথিত হইলেও কালক্রমে উহা মাটির সহিত মিশিয়া যায়। সুতরাং শবীর হইতে পৃথক্ আত্মা না মানিলে পবলোক স্বীকাব ব্যর্থ হইযা পড়ে।

দার্শনিকের আবিষ্কার

সচেতন জীবের পক্ষে সুখ ও দুঃখাভাবের প্রভেদ সর্বদা স্পষ্ট প্রকাশ না পাওযায় দুঃখাভাবের বিবোধী দুঃখ-পদার্থের সহিত সুখের সর্বতো-ভাবে বিরোধ থাকিবে মনে কবাই যুক্তিসঙ্গত কিন্তু বস্তুস্বভাব এমনই বিচিত্র যে উহাদের কাবণগত বিবোধ নাই। যে যে বস্তু সুখেব কাবণ দুঃখও সেইসকল বস্তু হইতেই আসিযা থাকে। ধনসম্পত্তি সুখের কারণ কিন্তু উহার অর্জনেব জন্য প্রথমে দুঃখ বরণ করিয়া লইতে হয়, অর্জিত ধন বক্ষা কবিতেও বহু দুঃখ ভোগ অনিবার্য। পুত্র অতিশয় প্রিয়। পুত্রেব সুখে নিজে সুখী হইবার আশায় লোকে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকে। বিবেকীর দৃষ্টিতে সেই পুত্র কতই-না দুঃখ সৃষ্টি করে। পুত্র জন্মিবামাত্র প্রিয়তমা পত্নীব অধিকাংশ দখল করিয়া বসে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করায়, পীড়িত হইলে অশেষ যাতনা দেয়, মরিলে মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করায়[১]। জাগতিক সকল বস্তুরই এইপ্রকার দুইটি দিক আছে। একদিক হইতে যাহা সুখজনক বলিয়া বোধ হইবে

---

১ **জায়মানো হরেজ্জায়াং বর্ধমানো হরেদ্ধনম্।
ম্রিয়মাণো হরেৎ প্রাণান্ নাস্তি পুত্রসমো রিপুঃ॥**

অন্যদিক হইতে বিচাব কবিলে দেখা যাইবে দুঃখ দিবার শক্তি তাহার মোটেই কম নহে।

বস্তুর ঐ দিকদুইটিব মধ্যে কোন্‌টি বড আব কোন্‌টি ছোট অর্থাৎ এক-একটি বস্তু হইতে সুখেব ভাগই বেশি পাওয়া যায় অথবা উহা হইতে দুঃখের ভাগই বেশি আসে তাহা স্থিব কবা কঠিন। এক শ্রেণীব চিন্তাশীলেবা মর্ত্যলোকেব সকল বস্তু হইতে দুঃখেব ভাগই অধিক আসে বিবেচনা করিয়া সুখেব মাত্রা বাডাইবার জন্য অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ফলে আবিষ্কৃত হইল স্বর্গ। স্বর্গেব সুখ বর্ণনাতীত। সেখানে জবা-মরণ-ব্যাধির দুঃখ নাই। ভোগ্য বস্তুগুলি ইচ্ছামাত্রে সুলভ, সেজন্য অর্জন-ক্লেশ সহ্য কবিতে হয না। দুঃখের ঝটিকাঘাত সুখপ্রবাহে বিচ্ছেদ ঘটাইতে পাবে না। এক কথায এই সুখ দুঃখেব সহিত অসম্ভিন্ন-অবিমিশ্র, কেবল সুখ মাত্র। ইহাব ভোগকালও. সুদীর্ঘ। এইরূপ সুখ অবশ্যম্ভাবী বুঝিলে ক্ষণভঙ্গুব ঐহিক সুখ, যাহা চাবিদিক হইতেই দুঃখ-ভারগ্রস্ত, তাহা ত্যাগ কবা কঠিন হয় না। যাঁহারা এই স্বর্গ এবং তাহা লাভের উপায় নির্দেশ কবিযাছিলেন তাঁহারাই ঋষি। সকল দেশেই জনসমাজে ঋষিদিগেব প্রভাব অসীম। যেখানে স্বর্গ এবং তাহার উপায় স্বরূপ ধর্ম স্বীকৃত হয় না এরূপ কোনও দেশ আছে কি না সন্দেহ।

স্বর্গ আবিষ্কারেও যাহারা তৃপ্ত হইলেন না, দেখিলেন, কুসুমে কীটের ন্যায় স্বর্গসুখের মধ্যেও ভোগের উৎকর্ষ-অপকর্ষ নিবন্ধন ঈর্ষ্যাদিবশতঃ এবং পতনভয়ে দুঃখের আবিলতা আছে; কেবল পতনের ভয় মাত্রই নহে, স্বর্গভ্রষ্টদিগকে পুনরায় মর্ত্যলোকে আসিতে হয়, সুতরাং তাহা-দিগের পূর্ববৎ সমুদায় দুঃখভোগ অনিবার্য, আবিষ্কৃত স্বর্গ তাঁহাদের চিন্তাস্রোত রুদ্ধ করিতে পারিল না। বিভিন্ন পথে আবার অনুসন্ধান চলিল। মুক্তির আবিষ্কারে ইহার সমাপ্তি।

সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সাযুজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন সংজ্ঞায় নানা প্রকার মুক্তির বর্ণনা বিভিন্ন শাস্ত্রে পাওয়া যায়। মুক্ত আত্মার সুখানুভূতি থাকে কি না এ বিষয়ে দার্শনিকেরা একমত নহেন, কিন্তু মুক্তি লাভ হইলে ভবিষ্যতে আর কখনও দুঃখ ভোগ করিতে হয় না ইহা নির্বিবাদ। মুক্তপুরুষের ভবিষ্যৎ সকল প্রকার দুঃখের হাত হইতে নিস্তার প্রাপ্তিকেই দার্শনিক পরিভাষায় বলা হয় অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তি। অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে নৈয়ায়িকেরা বলিয়াছেন—ইহা 'স্বসমানাধিকরণ দুঃখপ্রাগভাবাসমান কালীন' দুঃখ ধ্বংস।

এই পরিভাষা অনুসারে মুক্তি বা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি দুঃখধ্বংস স্বরূপ। দুঃখ দুইক্ষণ মাত্র স্থায়ী জীবাত্মার গুণবিশেষ। স্থূল পার্থিববস্তু বিভাগ করিলে উহার অবিভাজ্য অংশ বা বিভাগের বিশ্রাম স্থান যেরূপ পরমাণুতে আসিয়া পৌঁছে সেইরূপ দিনরাত্রি প্রভৃতি স্থূল কালের শেষ সূক্ষ্মসীমা ক্ষণ। দুঃখ-পদার্থ দুইক্ষণ মাত্র স্থিতিশীল এই সিদ্ধান্ত মানিলে জন্মাবধি মৃত্যু কাল পর্যন্ত একজন দীর্ঘজীবী লোক যত দুঃখ ভোগ করে তাহার সংখ্যা বিপুল দাঁড়ায়। সেই জীবেরই অনাদি জন্মান্তরসমূহে ভুক্ত দুঃখের হিসাব করিলে তাহা গণনার বাহিরে চলিয়া যায়। উৎপত্তির তৃতীয় ক্ষণে প্রত্যেক দুঃখেরই ধ্বংস হয়। সুতরাং প্রত্যেক জীবে তাহার দুঃখের সমসংখ্যক দুঃখপ্রাগভাব ও দুঃখধ্বংস স্বীকার্য। এই অগণিত দুঃখধ্বংস সমুদয়ের মধ্যে কোন্ ধ্বংসটি মুক্তির স্বরূপ বলিয়া গণ্য হইবে এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে—সেই জীবের যে দুঃখটি সর্বশেষে ঘটিয়াছে, সেই দুঃখের ধ্বংসই তাহার মুক্তি। সেই জীবের অন্যান্য সমস্ত দুঃখধ্বংসই ভাবি দুঃখগুলির প্রাগভাবের সমকালীন। কারণ, প্রাগভাবসকল স্বপ্রতিযোগী পদার্থের উৎপত্তির পূর্বে অনাদিকাল হইতে উহার আশ্রয়ে বিদ্যমান থাকে এবং প্রতিযোগী জন্মিলেই উহার বিনাশ ঘটে; ইহাই

প্রাগভাবের স্বভাব। শেষ দুঃখ— যে দুঃখটির পরে ঐ জীবের আর কোনও দুঃখই ঘটিবে না, তাহার ধ্বংসক্ষণে উহার সমুদায় দুঃখপ্রাগভাবই নষ্ট হওয়ায় কেবল শেষ দুঃখধ্বংসটিই ঐজীবের দুঃখ-প্রাগভাবের সমকালীন হইতেছে না। সুতরাং তাহাই মুক্তিলক্ষণাক্রান্ত। অন্য কোনও দুঃখ ধ্বংসই এই মুক্তি লক্ষণাক্রান্ত নহে।

মুক্তির কারণ আত্মতত্ত্বজ্ঞান। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবামাত্র কাহারও মোক্ষ লাভ হয়, ইহা শাস্ত্রসম্মত নহে। তাই মহর্ষি বলিয়াছেন— দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ। সূত্রের তাৎপর্য এই— জীব আত্মার স্বরূপবিষয়ে যথার্থ জ্ঞান লাভ করিলে তদ্দ্বারা প্রথমে তাহার আত্ম-বিষয়ে ভ্রান্তি দূর হয়। শরীর প্রভৃতি অনাত্মবস্তুকে আত্মা বলিয়া বুঝাই আত্মবিষয়ক ভ্রান্তি। ঐরূপ ভ্রান্তি বশতই 'আমি ব্রাহ্মণ, আমি মনুষ্য' ইত্যাদি ব্যবহার হইয়া থাকে। আত্মবিষয়ে উক্ত প্রকার ভ্রান্তি বা মিথ্যাজ্ঞান বশতঃ শরীরের পক্ষে যাহা সুখকর সেই বিষয়ে অনুরাগ এবং যাহা দুঃখজনক সেই বিষয়ে দ্বেষ জন্মে। বিষয়বিশেষে অনুরাগ এবং বিদ্বেষ এই উভয়ের সাধারণ সংজ্ঞা দোষ। দোষ হইতেই সকল প্রকার কর্মে প্রবৃত্তি জন্মে। প্রবৃত্তি হইলে লোকে চেষ্টা করিয়া যে কার্যই করুক তদ্দ্বারা তাহার ধর্ম ও অধর্ম হয়। এই ধর্ম ও অধর্ম সূত্রস্থ প্রবৃত্তি-শব্দের অর্থ। ধর্ম ও অধর্মের ফলে জন্ম অর্থাৎ আত্মার শরীর সম্বন্ধ ঘটে। এই জন্মই সমস্ত দুঃখের মূল কারণ। যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা আত্মবিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানের মূলোচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহার কোনও বিষয়ে রাগ-দ্বেষ-রূপ দোষ হয় না। দোষ না থাকিলে কর্ম করিলেও ধর্ম ও অধর্ম স্বরূপ প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না। যে প্রবৃত্তি জন্মের অসাধারণ কারণ তাহার অভাবে জন্ম ও সংঘটিত হইতে পারে না। জন্ম না হইলে শরীরাভাবে

দুঃখের কোনও সম্ভাবনাই থাকে না। এইরূপে আত্মতত্ত্বজ্ঞান দুঃখের মূল কারণপরম্পরার উচ্ছেদসাধন করিয়া মুক্তি লাভে উপযোগী হইয়া থাকে।

মানুষের এমন অনেক ধর্ম ও অধর্ম থাকে যাহার ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। মিথ্যাজ্ঞান দূর হওয়ায় নূতন ভাবে রাগ দ্বেষের সম্ভাবনা থাকে না বটে কিন্তু এই অবস্থায়ও পূর্বকৃত ধর্মাধর্মের ফল ভোগ করিবার জন্য মুমুক্ষুদিগকে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হয়। তখন তাহাদিগকে সাধারণ সংসারীর ন্যায় মনে হইতে পারে। বস্তুতঃ এই অবস্থার পুরুষগণ জীবন্মুক্ত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ দ্বারা এই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষেরই বর্ণনা করা হইয়াছে। কর্মফল ভোগ সমাপ্ত হইলে জীবন্মুক্তগণ দেহত্যাগ করতঃ পরমনির্বাণ বা বিদেহ কৈবল্য লাভ করেন।

মুক্তির স্বরূপ বিষয়ে মতভেদ আছে, কিন্তু উহার কারণ সম্বন্ধে মতভেদ নাই। মুক্তিবাদীরা সকলেই আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির কারণ স্বীকার করেন। সংসারী লোকেরা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন, কিন্তু তাহাদের আত্মজ্ঞান যথার্থ আত্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান নহে। কারণ, ঐ প্রকার আত্মজ্ঞানে আত্মার যে স্বরূপ প্রকাশ পায় আত্মা ঠিক সেই প্রকার নহে। আত্মা অতিশয় দুর্জ্ঞেয় বস্তু। অনুভব, যুক্তি এবং শ্রুতি এই প্রমাণ ত্রয়ের সাহায্য ব্যতীত আত্মার স্বরূপ বুঝা সম্ভব নহে। মিলিত প্রমাণ-ত্রয়ের দ্বারা আত্মার স্বরূপ যাহা নির্ধারিত হয়, সংসারী লোকের আত্ম-জ্ঞানে ঠিক তাহা প্রকাশিত হয় না বরঞ্চ উহার বিপরীত ভাবই প্রকাশ পায়।

শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা বুঝা যায় প্রত্যেক জীবাত্মাই বিভু বা পরম মহৎ পরিমাণ বিশিষ্ট অর্থাৎ আকাশের ন্যায় সমস্ত মূর্ত[২] পদার্থে সংযুক্ত।

২ মূর্ত— আকাশ, আত্মা দিক্‌ ও কাল ব্যতীত সকল দ্রব্যই মূর্ত

অথচ সংসারী লোকেরা অনুভব করে, তাহাদের আত্মা পরিচ্ছিন্ন; যেহেতু সামান্য আসন শয্যা ব্যবহার কালে উহার সকল অংশে আত্মার সম্বন্ধ হয় না। আত্মা নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তিশূন্য এবং অবিনাশী; ইহা শ্রুতিও যুক্তি সম্মত। পক্ষান্তরে দেখিতে পাই জীবের জন্ম-মৃত্যু সর্বদাই ঘটিতেছে। অতএব সংসারিগণ যে-প্রকার আত্মজ্ঞান লইয়া চলিয়া থাকেন উহাই অযথার্থ বা ভ্রান্তি এবং শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা আত্মার যে-স্বরূপ নির্ধারিত হয় ঠিক সেইপ্রকারে আত্মজ্ঞানই যথার্থ আত্মজ্ঞান বা আত্ম বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান, ইহা স্বীকার্য।

এক দিকে সমগ্র বিশ্বের সংসারীলোক, অন্যদিকে কয়েকখানি শাস্ত্রগ্রন্থ ও উহাতে উল্লিখিত কয়েকটি যুক্তি; ইহাদের পরস্পরবিরোধে সংসারী-লোকের পক্ষই জয়ী হইত যদি উহাদের সকলেরই আত্মজ্ঞান একই বস্তু অবলম্বনে উৎপন্ন হইত এবং অপরিবর্তিত থাকিত। সংসারের সকল লোক কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে 'আত্মা' বলিয়া বুঝে এবং একবার যে-বস্তুকে 'আত্মা' মনে করিয়াছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া সময়ান্তরে অন্য বস্তুর প্রতি আত্মবুদ্ধি পোষণ করে।

আমি (অহম্=অস্মদ্) শব্দে যাহা বুঝা যায় তাহাই আত্মা। যে-বস্তুর যে-প্রকার অবস্থা ঘটিলে 'উহা আমার' এই প্রকার বুদ্ধি জন্মে সেই অবস্থা আত্মারই গুণ বা ধর্ম। সুতরাং 'আমি' এবং 'আমার' এই কথা দুইটি যে জ্ঞানের পরিচায়ক লৌকিক দৃষ্টি অনুসারে তাহাই আত্মজ্ঞান।

একই আত্মা নিত্য ও অনিত্য, সর্বব্যাপী মহান্ এবং অত্যন্ত পরিচ্ছিন্ন এইরূপ বিরুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন ইহা স্বীকার করা যায় না। এজন্য উভয় আত্মজ্ঞানের একটি মিথ্যা বা ভ্রম, ইহা মানিতেই হইবে। দর্শনশাস্ত্রে যুক্তির মূল্য সমধিক।

দেহ স্থূল অথবা কৃশ হইলে লোকে বলিয়া থাকে— আমি স্থূল, আমি

কৃশ ইত্যাদি। এই ব্যবহারে বুঝা যায় ভৌতিক দেহই আত্মা। আমি অন্ধ, আমি বধির ইত্যাদি ব্যবহারে চক্ষু ও কর্ণ আত্মা। কারণ অন্ধত্ব ও বধিরত্ব যথাক্রমে চক্ষু ও কর্ণেন্দ্রিয়ের ধর্ম। এই প্রকারে মন বুদ্ধি ইত্যাদি বস্তুও আত্মা বলিয়া প্রতীত হয়, ইহা নানা গ্রন্থে পাওয়া যায়। সুতরাং সমগ্র সংসারীলোকেরা একই বস্তুকে আত্মা মনে করে না। একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন সময়ে উল্লিখিত দুই প্রকার ব্যবহার করিতেও দেখা যায়। অতএব সংসারীদিগের আত্মজ্ঞান পরিবর্তনশীল। কোনো ব্যক্তিবিশেষের কিংবা সময়বিশেষের আত্মজ্ঞান যথার্থ অন্য সময়ের ও অন্য ব্যক্তির আত্মজ্ঞান ভ্রম, ইহা মানিবার যুক্তি নাই। এজন্য স্বীকার করিতে হয়, ঐ প্রকার সকল আত্মজ্ঞানই ভ্রম। এইরূপে আত্মার স্বরূপ-নির্ণয়ে বিশ্ববাসীর ব্যবহার যুক্তির নিকটে পরাজিত হইয়াছে। যুক্তির জয় ঘোষণায় স্থির হইয়াছে, আত্মা নিত্য সর্বব্যাপী ও চেতন।

আত্মার এই স্বরূপ স্থিরভাবে বুঝিবার জন্য অপরাপর বস্তুর জ্ঞান বিশেষ আবশ্যক। তাই শাস্ত্রে নানাপ্রকারে শ্রেণীভাগ করিয়া যাবতীয় পদার্থের জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে।

পদার্থ বিভাগ

বৈশেষিক মতে পদার্থসমূহ সাত প্রকার : দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব।

অগণিত পদার্থসমূহকে মাত্র সাত ভাগে বিভক্ত করার কথা শুনিলে হঠাৎ চমক লাগে। মনে হয়, একজন সাধারণ মানুষও যাহা জানে তৎসমুদায়ও এই বিভাগের গণ্ডী ছাড়াইয়া যাইবে। কিন্তু ঐ বস্তুগুলির অবান্তর বিভাগের প্রতি দৃষ্টি করিলেই বুঝা যাইবে ঐ রূপ ধারণা ভুল।

দ্রব্য নয় প্রকার : পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, মন ও আত্মা।

পৃথিবী

পৃথিবীর লক্ষণ গন্ধ। যাহাতে কোনোরূপ গন্ধ আছে তাহাই পৃথিবীর অন্তর্গত। পৃথিবী নিত্য এবং অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ। নিত্য পৃথিবী—পার্থিব পরমাণু। অনিত্য পৃথিবী ত্রিবিধ—দেহ ইন্দ্রিয় ও বিষয়।

মর্ত্যলোকে প্রাণিদেহে উপাদান পৃথিবী। ইহা জল, তেজঃ ও বায়ু এই ত্রিবিধ দ্রব্যের সহকারিতায় সৃষ্ট হয়। তাই আমাদিগের দেহ পার্থিব অর্থাৎ পৃথিবী হইতে উৎপন্ন। যে-ইন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধ অনুভূত হয় তাহা ঘ্রাণেন্দ্রিয়। শরীরের যে অংশ নাসিকা বা নাক নামে ব্যবহৃত হয় উহার মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম পার্থিব অংশ ঘ্রাণেন্দ্রিয়। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের আয়তন বলিয়াই চক্ষুর্দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থূল পার্থিব অংশও ঘ্রাণ নামে ব্যবহৃত হয়। দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক, চতুরণুক হইতে ক্রমশঃ স্থূলের দিকে অগ্রসর হইলে ব্রহ্মাণ্ডের কথা আসিয়া পড়ে। এই ব্রহ্মাণ্ডও পার্থিব।

কোনও প্রাচীন সম্প্রদায় মনে করিতেন, পার্থিব বস্তু সকল খর অর্থাৎ কঠিন বা কর্কশ রূপেই অনুভূত হয়। ঘট শরাব লৌহ প্রস্তর প্রভৃতিতে খরত্ব স্পষ্ট অনুভূত হয়। তথাপি খরত্বই সর্বত্র পৃথিবীর পরিচায়ক স্বীকার করা যায় না। কারণ, তুলা তেল মাখন ইত্যাদি পদার্থও পার্থিব। পক্ষান্তরে হিমানী অর্থাৎ বরফ কঠিনরূপে অনুভূত হয়, তথাপি উহা পার্থিব নহে।

জল

জল দ্বিতীয় দ্রব্য। ইহা সকলের পরিচিত। সাধারণতঃ জল তরল বা দ্রবরূপে অনুভূত হয়। তথাপি দ্রবত্ব কেবল জলেরই গুণ নহে। পার্থিব দ্রব্য তৈল ঘৃত প্রভৃতি এবং তৈজস দ্রব্য স্বর্ণে দ্রবত্ব দেখা যায়। বরফ স্বরূপতঃ জল কিন্তু উহাতে দ্রবত্ব প্রকাশ পায় না।

নিত্য ও অনিত্য এই বিভাগ বশতঃ জলও দ্বিবিধ। জলের পরমাণু সকল নিত্য। পরমাণু ব্যতীত জল অনিত্য। অনিত্য জল ত্রিবিধ— শরীর, ইন্দ্রিয় এবং বিষয়। জলময় শরীর বরুণলোকে আছে, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ। এই প্রকার শরীরেও পৃথিবী, তেজঃ ও বায়ু সহকারী, জল উপাদান মাত্র। জিহ্বা জল-ইন্দ্রিয়। যে অঙ্গ জিহ্বা নামে ব্যবহৃত হয় তাহা পার্থিব, উহার মধ্যবর্তী জলময় অংশই আসল জিহ্বা বা রসনা-ইন্দ্রিয়। দ্ব্যণুক হইতে সমুদ্র পর্যন্ত সকল জল বিষয়-বিভাগের অন্তর্গত।

তেজঃ

তৃতীয় দ্রব্য— তেজঃ। তেজোময় দ্রব্যসকল উষ্ণ বলিয়া পরিচিত। জল স্বভাবতঃ শীতল। উষ্ণ তেজঃকণার সম্পর্কবশতঃ জলের শৈত্য অভিভূত হইলে উহাতে তেজোধর্ম উষ্ণত্ব আরোপিত হয়। তেজঃ-পদার্থের উষ্ণতাও অভিভূত হওয়ায় সর্বত্র অনুভূত হয় না। স্বর্ণ তৈজস বস্তু। প্রচুর পার্থিব অবয়বদ্বারা অভিভূত থাকায় স্বর্ণের উষ্ণতা প্রায়শঃ অনুভূত হয় না। অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অন্যরূপ।

জলের ন্যায় তেজঃও নিত্য এবং অনিত্য। তৈজস পরমাণুসকল নিত্য। অপর তৈজস দ্রব্য অনিত্য। অনিত্য তেজঃ ত্রিবিধ— শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। আদিত্য লোকে তৈজস দেহের অস্তিত্ব শাস্ত্র হইতে জানা যায়। চক্ষুঃ— তৈজস ইন্দ্রিয়। দ্ব্যণুক হইতে সূর্য পর্যন্ত বিষয় তেজঃ। ইহা ভৌম, আকরজ, উদর্য এবং দিব্য এই প্রকারে চতুর্ধা বিভক্ত। ভৌম তেজঃ— তৃণ কাষ্ঠাদি পার্থিব দ্রব্যে অবস্থিত অগ্নি। আকরজ তেজঃ— খনিতে উৎপন্ন স্বর্ণ প্রভৃতি বরধাতু। উদর্য তেজঃ— ভুক্তদ্রব্যের পরিপাককারী পাচক অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ। দিব্যতেজঃ বাড়বানল বজ্রাগ্নি ইত্যাদি।

বায়ু

চতুর্থ দ্রব্য বায়ু। ইহাও পূর্বোল্লিখিত দ্রব্যত্রয়ের ন্যায় লোক-প্রসিদ্ধ। বায়ু প্রত্যক্ষযোগ্য কি না তাহা বিবাদগ্রস্ত। অতিপ্রাচীন এবং আধুনিক মতে ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা বায়ুর প্রত্যক্ষ স্বীকৃত হয়। অন্যমতে বায়ুর স্পর্শই ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, পরে তদ্দ্বারা বায়ু অনুমিত হয়।

বায়ু দ্বিবিধ— নিত্য ও অনিত্য। পরমাণু বায়ু নিত্য, অপর সকল বায়ু অনিত্য। অনিত্য বায়ু ত্রিবিধ: শরীর, ইন্দ্রিয় এবং বিষয়। বায়ুলোকের শরীর বায়ব্য। ত্বক্ বায়ব্য ইন্দ্রিয়। দ্ব্যণুকাদি মহাবায়ু পর্যন্ত সকল বায়ু বিষয়বিভাগের অন্তর্গত। শবীরের অভ্যন্তরবর্তী বায়ুসকল বিভিন্ন প্রকারে কার্য করে। সেজন্য তাহাদের প্রাণ অপান ব্যান সমান ও উদান এই পঞ্চবিধ সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

আকাশ

পঞ্চম দ্রব্য আকাশ। বায়ু প্রত্যক্ষযোগ্য নহে কিন্তু উহার স্পর্শ প্রত্যক্ষ হয় এবং তদ্দ্বারা ঐ স্পর্শের আশ্রয় বায়ু অনুমিত হয় এই সিদ্ধান্ত যাঁহারা স্বীকার করেন অনুরূপ দৃষ্টান্তের সাহায্যে দুর্জ্ঞেয় আকাশ পদার্থ সম্বন্ধে ধারণা করা তাহাদের পক্ষে কঠিন হয় না। শব্দ কর্ণেন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। বিশেষ আলোচনার ফলে স্থির হইয়াছে, শব্দ, পৃথিবী জল তেজঃ এবং বায়ু এই চারি মহাভূতের মধ্যে কাহারও গুণ নহে এবং কাল দিক্ মন এবং আত্মা ইহাদিগের মধ্যে কোনটিও ইহার আধার হইতে পারে না। অথচ শব্দ গুণশ্রেণীর অন্তর্ভূত। অতএব উহার আশ্রয় হিসাবে অন্য দ্রব্য অবশ্যই মানিতে হইবে। উহাই আকাশ। আকাশ অবকাশ, শূন্য ইত্যাদি রূপে জ্ঞানের বিষয় হয়। ইহা সর্বব্যাপী। অপর কোনো দ্রব্য ইহার বিরোধী হয় না। একটি কলস জলে পরিপূর্ণ করিলে উহাতে অপর কোনও বস্তুর অবস্থান সম্ভবে না। ঐ জলের

মধ্যে মাটি বা পাথর ফেলিলে কতকটা জল নিশ্চয়ই বাহির হইয়া যাইবে। আকাশ কিন্তু জলশূন্য অবস্থায় যেমন ছিল, জলপূর্ণ অবস্থায়ও ঠিক সেইরূপই থাকে। ফলে কলস হইতে জল ফেলিয়া দিলে উহার মধ্যভাগে যে-শূন্যতা প্রতীত হয় তাহাই আকাশ। এই আকাশ সর্বত্র সমভাবে বিদ্যমান এবং নিত্য। ইহা একমাত্র বস্তু, অর্থাৎ পার্থিব বস্তু, যেমন ঘট পট ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থিত, আকাশ সেরূপ নহে। এক গৃহ মধ্যে যে আকাশ গৃহান্তরেও সেই আকাশ, উভয় গৃহের মধ্যবর্তী প্রাচীরের ভিতরেও উহাই বিদ্যমান। পূর্বোল্লিখিত দ্রব্যসমূহের ন্যায় আকাশের স্বাভাবিক কোন বিভাগ নাই। আকাশের ঔপাধিক বিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে। কর্ণশঙ্কুলীরূপ উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন আকাশই কর্ণেন্দ্রিয়।

পৃথিবী জল তেজঃ বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চবিধ দ্রব্যের সাধারণ সংজ্ঞা ভূত। মহাভূত শব্দও উহাদিগকেই বুঝায়। সমস্ত অনিত্য দ্রব্যই এই মহাভূতপঞ্চকের সংমিশ্রণে জন্মে, এইরূপ কথা অন্য দার্শনিকেরা বলিয়া থাকেন। বৈশেষিকের মত কিছু স্বতন্ত্র। এই মতে আকাশ সর্বত্র বিদ্যমান থাকিয়াও কোনো দ্রব্যসৃষ্টির কারণ নহে। পৃথিবী জল তেজঃ এবং বায়ু ইহারাই দ্রব্যসৃষ্টির কারণ। আরও বিশেষ এই, এক এক জাতীয় দ্রব্যে একবিধ ভূতই উপাদান বা সমবায়ি কারণ এবং অন্য ভূতত্রয় উপষ্টম্ভ বা নিমিত্তকারণরূপে স্বীকৃত। মর্ত্যলোকে শরীরের উপাদান পৃথিবী, জল তেজঃ এবং বায়ু উহাতে উপষ্টম্ভক।

প্রলয়ে মহাভূতবর্গের ধ্বংসে ব্রহ্মাণ্ডের পরিণতি কি প্রকার হয় তৎপরে কি পদ্ধতিতে নূতন জগৎ গড়িয়া উঠে এখন তাহা বর্ণিত হইবে।

সৃষ্টির কোনও আদি কাল নাই। এই ভূমণ্ডল চন্দ্র সূর্য প্রভৃতি যে অনাদি কাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ঠিক এক আকারে আছে তাহা নহে। কালের আবর্তনবশতঃ ক্ষয় ও বৃদ্ধি দ্বারা উহারা পরিদৃশ্যমান এই আকার লাভ করিয়াছে। একটি নারিকেল বা

তালের আঁটি (বীজ) মাটিতে ফেলিয়া রাখিলে তাহা হইতে অঙ্কুর জন্মে। অঙ্কুর হইতে কাণ্ড জন্মে। কাণ্ডের পরে পর্ব। ক্রমে শাখা, ফুলও ফল উৎপন্ন হয়। এই শাখা পত্র পুষ্প ফল সমন্বিত বৃক্ষের মূল কারণ উল্লিখিত সেই বীজ। এই বৃক্ষের সৃষ্টি কবে হইল কেহ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে আমরা উত্তর দিলাম, ৩০শে আশ্বিন অর্থাৎ যে দিন বীজে অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল সেই দিন উহা জন্মিয়াছে। এই প্রকার উত্তর দিবার সময়ে বৃক্ষের মূল কারণ সেই বীজ কবে কোথায় জন্মিয়াছিল তাহা প্রশ্ন ও উত্তরের বাহিরেই থাকিয়া যায়। তথাপি সেই বীজও কিছুকাল পূর্বে এই প্রকার একটি নারিকেল বা তালগাছ হইতেই জন্মিয়াছিল, ইহা সকলকেই মানিতে হয়। সুতরাং বীজের পূর্বে যেমন বৃক্ষের অস্তিত্ব স্বীকার আবশ্যক এবং অঙ্কুরই বৃক্ষের প্রথম অবস্থারূপে বর্ণিত হয় তদ্রূপ এই ভূমণ্ডল সূর্য চন্দ্র প্রভৃতিরও যে সময়ে অঙ্কুর স্থানীয় কোনোরূপ প্রাথমিক অবস্থা ছিল সেই সময়কেই জগৎসৃষ্টির প্রারম্ভ কাল বলা হয় এবং জগতের সেই বীজস্থানীয় মূলকারণ লাভের জন্য পূর্ববর্তী জগতের অস্তিত্ব স্বীকারও স্বতই আসিয়া পড়ে। এই প্রকারে বর্তমান জগতের উৎপত্তির জন্য পূর্ববর্তী জগৎ আবশ্যক হইলে সেই জগতের জন্যও এই নিয়মে তৎপূর্বে আর-এক জগতের প্রয়োজন। তাই বলা হয় সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি। বৃক্ষ হইতে পক্ব ফলের পতন এবং ঐ কালের বিকৃত বা অবিকৃত অবস্থায় পুনরায় মৃত্তিকায় স্থান লাভ এবং অঙ্কুরোদ্গম এই দুই ব্যাপারের অন্তরালে যে সময়টি অতিক্রান্ত হয় জগৎ সম্বন্ধে প্রলয় কাল ঠিক সেইরূপ। বীজ যেমন বৃক্ষের মূল কারণ তদ্রূপ কতকগুলি পরমাণু এই জগতের বীজ স্থানীয় মূল কারণ। ঐ পরমাণুগুলি চতুর্বিধ : পার্থিব, আপ্য বা জলীয়, তৈজস এবং বায়ব্য।

ব্রহ্মার আয়ু বা অধিকার কাল এক শত বৎসর। আমরা যে

প্রকারে বৎসর গণনা করি ব্রহ্মার বৎসর সেই হিসাবে নির্ধারিত হয় না। ব্রহ্মার বৎসর মনুষ্যলোকের বৎসর হইতে অনেক বড়।

ক্ষণ কালের সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম অংশ। দুই ক্ষণে এক লব। দুই লবে এক নিমেষ। আঠারো নিমেষে এক কাষ্ঠা। ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা। ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত। ত্রিশ মুহূর্তে এক অহোরাত্র, অর্থাৎ পনরো মুহূর্তে একটি দিন এবং পনরো মুহূর্তে এক রাত্রি। পনরোটি অহোরাত্রে এক পক্ষ। দুই পক্ষে এক মাস। দুই মাসে এক ঋতু। তিন ঋতুতে এক অয়ন। দুই অয়নে এক বৎসর। ইহা মনুষ্য-লোকের বৎসর। এইরূপ এক বৎসর দেবতাদিগের পক্ষে একটি মাত্র অহোরাত্র অর্থাৎ মনুষ্যলোকের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন যথাক্রমে দেবতা-দিগের দিন ও রাত্রি। ত্রিশটি দৈব অহোরাত্রে অর্থাৎ আমাদিগের ত্রিশ বৎসরে দেবগণের একমাস। দৈব দ্বাদশ মাসে, আমাদিগের ৩৬০ বৎসরে, দেবতাদিগের এক বৎসর। দৈব বারো হাজার বৎসরে চার যুগ। এই প্রকার চার সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন। সুতরাং আট হাজার যুগে ব্রহ্মার এক অহোরাত্র। এইরূপ তিনশত ষাট অহোরাত্রে এক ব্রাহ্ম বর্ষ। পুর্ণ একশত ব্রাহ্ম বর্ষ ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল।

আয়ু পূর্ণ হইলে ব্রহ্মার মুক্তি হয়। তখন সংসার ব্যাপারে পরিশ্রান্ত সমস্ত জীবগণকে বিশ্রামের অবসর দিবার জন্য সকল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি মহেশ্বরের ‘ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হউক’ এই প্রকার সংহারেচ্ছা জন্মিল[৩]। এইরূপ ইচ্ছাবশতঃ তৎক্ষণাৎ সমস্ত জীবাত্মার

৩ ঈশ্বরের ইচ্ছা একটি মাত্র এবং তাহা নিত্য। উৎপত্তিশীল সমস্তই সেই একমাত্র ইচ্ছায় নদীপ্রবাহে তরঙ্গের ন্যায় গ্রথিত রহিয়াছে। মনুষ্যের বুদ্ধি ক্রিয়া বিবর্তিনী। তাই বিষয়ের উৎপত্তি ইচ্ছায় আরোপ করিয়া বলা হইয়াছে— মহেশ্বরের সংহারেচ্ছা জন্মে। কারণ, অন্য প্রকারে ব্যবহার সম্ভবে না। পঞ্চদশীতেও দেখা যায়—কালাভাবে পুরেত্যুক্তিঃ কালবাসনয়া যুতম্। শিষ্যংপ্রত্যেব তেনাত্র দ্বিতীয়ং নহি শঙ্ক্যতে।

অদৃষ্টসমূহ স্তব্ধ, কার্যাক্ষম হইল। পুর্বে এইসব অদৃষ্টের শক্তি বলে অবয়বসমুদায় সংহত হইয়া শরীরও ইন্দ্রিয়গণের (এবং মহাভূতবর্গের) পরিদৃশ্যমান এই আকার সৃষ্টি করিয়াছিল। এখন অদৃষ্টের সেই শক্তি রুদ্ধ হওয়ায় সেইসকল অবয়বে ক্রিয়া জন্মিল। ক্রিয়ার ফলে অবয়বগুলি বিভক্ত হইয়া পড়িল এবং সংঘাতজনক সংযোগসমূহ ধ্বংস হইল। তখন শরীর, ইন্দ্রিয় এবং মহাভূত বর্গ এই বর্তমান আকার ত্যাগ করিয়া অবয়বরূপে উপস্থিত হইল।

তখনই সেইসকল অবয়বও বিভক্ত হইল এবং আরও অধিক ক্ষুদ্রতর অবয়ব বাহির হইল। ক্রমশঃ অবয়বেব বিভাগ স্থূলত্বের আরম্ভসীমা ত্রসরেণুতে পৌঁছিল। প্রত্যেক ত্রসরেণুর অবয়ববিভাগে তিন-তিনটি দ্ব্যণুক প্রকাশ পাইল। পরক্ষণেই পরমেশ্বরের ইচ্ছা এবং জীবাত্মাদিগের সংযোগবশতঃ পরমাণুসকলে ক্রিয়া জন্মিল। সেই ক্রিয়ার ফলে পরমাণু-যুগল পৃথক্ বা বিশ্লিষ্ট হওয়ায় দ্ব্যণুকসমূহও নষ্ট হইল। কেবল চতুর্বিধ পরমাণুসকল তখন অবশিষ্ট রহিল। ইহাই প্রলয় কাল।

মহাভূতবর্গের বিনাশও এই ক্রমে ঘটিয়া থাকে। সর্বপ্রথমে পৃথিবী পরমাণু আকারে পর্যবসিত হয়। তৎপরে জলের এবং তাহার পরে তেজের ও সর্বশেষে বায়ুর পরমাণু-আকার উপস্থিত হয়।

এইরূপে প্রলয় ঘটিলে চতুর্বিধ পরমাণুসমূহ এবং ধর্ম, অধর্ম ও ভাবনা সংস্কার সমন্বিত জীবাত্মাসকল ব্রাহ্ম শতবর্ষপরিমিত সময় নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষা করিতে থাকে[৪]।

প্রলয়ের অবসানে পুনরায় জীবদিগকে সুখ দুঃখ ভোগ করাইবার উদ্দেশ্যে সৃষ্টিবিষয়ে মহেশ্বরের ইচ্ছা হয়। তাহাতে সমস্ত জীবাত্মার

---

৪ দিক্, আকাশ, কাল ও মনসমূহ নিত্য। প্রলয়কালে ইহারা এবং সমস্ত দ্রব্যের নিত্য গুণসকল ও সর্ববিধ জাতি, বিশেষসমূহ, সমবায় এবং প্রাগভাব ব্যতীত অপর অভাবগুলি বিদ্যমান থাকে।

অসংখ্য বিচিত্র অদৃষ্ট সমুদায়ে সৃষ্টির অনুকূল শক্তি স্ফুরিত হয়। তাহাতে প্রথমে বায়ব্য পরমাণুসমূহে স্পন্দন জন্মে, তদ্দ্বারা দুইটি বায়ু-পরমাণু সংযুক্ত হইলে বায়ুদ্ব্যণুক সৃষ্টি হয়। পরে তিনটি বায়ুদ্ব্যণুকের পরস্পর সংযোগে ত্রসরেণু বা ত্র্যণুক বায়ু জন্মে। অনন্তর দুই তিন চারি অথবা ততোধিক ত্রসরেণু মিলিত হইলে ক্রমশঃ স্থূলতর ও স্থূলতম আকার লাভকরতঃ মহাবায়ু উৎপন্ন হয় এবং তাহা গগনমধ্যে প্রচণ্ড-বেগে বহিতে থাকে। অনন্তর সেই মহাবায়ুর মধ্যে জল-পরমাণুসমূহ উল্লিখিত প্রণালীতে দ্ব্যণুক ও ত্রসরেণু ক্রমে মহাসমুদ্র সৃষ্টি করে।

অনন্তর সেই মহাসমুদ্রে প্রথমে পার্থিব পরমাণুসমূহ দ্ব্যণুকাদি ক্রমে মহাপৃথিবী, তৎপরে তৈজস পরমাণুসকল সেই নিয়মে মহাতেজোরাশি সৃষ্টি করে[৫]। কোনো বস্তুদ্বারা অভিভূত না হওয়ায় ঐ তেজোরাশি অতিশয় দীপ্তিযুক্ত থাকে। এই প্রকারে মহাভূতচতুষ্টয় উৎপন্ন হইলে পরমেশ্বরের ইচ্ছাবশতঃ তৈজস অণুসমূহ হইতে অতিশয় বৃহৎ একটি অণ্ড জন্মিল। পার্থিব পরমাণুসমূহের বিশেষ সম্বন্ধ থাকায় ঐ অণ্ড বহ্নিপুঞ্জের ন্যায় উত্তপ্ত হইল না। পরমেশ্বর সেই অণ্ডমধ্যে বহু ভুবনমণ্ডল এবং সকল লোকের পিতামহ চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত নিযুক্ত করিলেন। ব্রহ্মা অতিশয় জ্ঞান বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য সম্পন্ন। পরমেশ্বরের নিয়োগে তিনি সমস্ত জীবের কর্মবিপাক অর্থাৎ কোন্

---

৫ শ্রুতি বলেন, 'আকাশাদ্ বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী' অর্থাৎ আকাশ হইতে বায়ুর, বায়ু হইতে অগ্নির, অগ্নি হইতে জলের এবং জল হইতে পৃথিবীর ক্রমে উৎপত্তি হইয়াছে। সৃষ্টির বিপরীত ক্রমে প্রলয় ঘটে, ইহা বহুসম্মত সিদ্ধান্ত। আচার্য প্রশস্তপাদও সেই ক্রম পূর্বে ব্যক্ত করিয়াছেন। পৃথিবী সৃষ্টির পরে অগ্নি সৃষ্ট হইয়াছিল ইহাও শ্রুতি হইতে পাওয়া যায়। 'আপো বা অর্কঃ, তদ্ যদপাং শর আসীৎ তৎ সমহন্যত, সা পৃথিব্যভবৎ, তস্যামশ্রাম্যৎ, তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য তেজোরসো নিরবর্ততাগ্নিঃ'। বৃহদারণ্যক ১।২ এই শ্রুতিতে পৃথিবীকে অগ্নির আধার বলা হইয়াছে। বৈশেষিক ভাষ্যে কিন্তু বলা হইয়াছে মহাসমুদ্রই অগ্নির আধার।

জীবের পূর্বজন্মে কৃত কর্ম কিরূপ এবং তদনুসারে তাহার জন্ম, আয়ু এবং সুখ দুঃখ ভোগ কি প্রকার হওয়া উচিত তাহা জানিয়া স্বীয় মানসপুত্র দক্ষাদি প্রজাপতি এবং মনু, দেবর্ষি ও পিতৃগণকে সৃষ্টি করতঃ স্ব স্ব কর্মানুরূপ জ্ঞান, ভোগ এবং আয়ুর যোগ্য করিলেন। তৎপরে স্বীয় মুখ বাহু উরু এবং চবণ হইতে বর্ণদিগকে (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র) ও উচ্চ নীচ শ্রেণীর অন্যান্য প্রাণিগণকে সৃষ্টি ও তাহাদিগের স্ব স্ব কর্মানুরূপ ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য দান করিলেন। জ্ঞানের উৎকর্ষবশতঃ জীবদিগেব সঞ্চিত কর্ম বিষয়ে যেমন ব্রহ্মার ভ্রম হয় নাই সেইরূপ বৈরাগ্যবশতঃ তাঁহার পক্ষপাতদোষ হইতে পাবে না এবং অতিশয় ঐশ্বর্য (কর্মক্ষমতা) বশতঃ তিনি সকলকে যথোচিত ফল ভোগ করাইতে পারেন।

কাল

ষষ্ঠ দ্রব্য কাল। আকাশের ন্যায় ইহা নিত্য, সর্বব্যাপী ও একমাত্র বস্তু অর্থাৎ স্বাভাবিক ভেদশূন্য। বিভিন্ন উপাধির সম্বন্ধবশতঃ এই একমাত্র দ্রব্যই দিন রাত্রি পক্ষ, মাস ঋতু অয়ন বৎসর যুগ ইত্যাদি ব্যবহারের বিষয় হয়। পার্থিব দ্রব্যের সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম অংশ পরমাণু উহা পৃথিবীর স্বাভাবিক ভেদ বা বিভাগ। কালের পক্ষে ঐরূপ সূক্ষ্ম অংশ 'ক্ষণ'-নামে প্রসিদ্ধ, বিশেষ এই যে ক্ষণ কালের উপাধি কৃত বিভাগ, স্বাভাবিক নহে।

দিক্

সপ্তম দ্রব্য দিক্। ইহাও নিত্য, সর্বব্যাপী এবং একমাত্র দ্রব্য। একই দিক্-দ্রব্য উপাধিভেদে পূর্ব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যবহারের হেতু হইয়া থাকে।

যে সমুদায় উপাধির সম্বন্ধবশতঃ কাল ও দিক্ বিভিন্ন ব্যবহার সম্পাদন করে সেইসকল উপাধি পরিহার করিলে এই দুই দ্রব্যের পরস্পর ভেদ বুঝা কঠিন।

মন

মন অষ্টম দ্রব্য। কাল ও দিকের ন্যায় ইহা নিত্য কিন্তু সর্বব্যাপী অথবা একমাত্র নহে; বরঞ্চ অতিক্ষুদ্র, পরমাণু তুল্য এবং অসংখ্য। প্রত্যেক জীবের এক-একটি মন স্বীকৃত হয়। সুতরাং মনের সংখ্যা গণনার বহির্ভূত হইলেও উহা জীবের সমসংখ্যক বলা যায়।

বাহ্যবস্তু প্রত্যক্ষ করিবার জন্য চক্ষু ত্বক্ কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় স্বীকার করিতে হয়। সেইরূপ সুখ দুঃখ ইত্যাদি আন্তর বস্তু অনুভব করিবার জন্য মন-নামক এই অষ্টম দ্রব্য মানিতে হয়। মন সক্রিয় না হইলে কোনো প্রকার জ্ঞানই জন্মিতে পারে না।

আত্মা

আত্মা নবম দ্রব্য। আত্মার দুই বিভাগ: জীব ও ঈশ্বর।

উভয় প্রকার আত্মাই আকাশের ন্যায় নিত্য এবং সর্বব্যাপী। তবে ঈশ্বর বা পরমাত্মা আকাশের মত এক-অদ্বিতীয়, কিন্তু জীব বা জীবাত্মা মনের ন্যায় বহু।

পূর্বে পার্থিব জলময় তেজোময় ও বায়ব্য ভেদে যে চতুর্বিধ শরীরের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটির সহিত এক-একটি মন ও এক-একটি জীবাত্মার এমন-কোনো বিশেষ সম্বন্ধ স্বীকৃত হয় যাহাতে প্রত্যেক জীব অপর সমুদায় শরীরের সহিত সংযুক্ত থাকিয়াও ঐসমস্ত শরীরে উৎপন্ন সুখদুঃখাদি অনুভব করিতে পারে না প্রত্যুত সেই বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত একটি মাত্র শরীরে পরিচ্ছিন্ন সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

পূর্বোল্লিখিত আট প্রকার দ্রব্যের সমস্তগুলিই ভোগের সাহায্য করে ; কোনোটি কর্মহিসাবে, কোনোটি বা আশ্রয়স্বরূপে, অপরটি অন্যবিধ সহকারীহিসাবে। শরীরসমূহ সকলপ্রকার ভোগের আশ্রয় বা আয়তন। মাল্যচন্দন অলংকারাদি ভৌতিক অধিকাংশ বস্তুই ভোগ্য বা ভোগের কর্ম। ভৌতিকবিশেষ— ইন্দ্রিয়বর্গ ও মন ভোগের করণ বা কারণবিশেষ। অতএব ঐ অষ্টবিধ দ্রব্যের মধ্যে কোনোটিই ভোক্তা নহে। কর্তা ব্যতীত কোনো ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারে না। আবার কোনো ক্রিয়ার কর্ম কিংবা করণই উহার কর্তা হইবে ইহাও অনুভব-বিরুদ্ধ। গমনক্রিয়ার কর্ম গ্রাম এবং করণ পাদদ্বয়, ভোজন ক্রিয়ার কর্ম অন্ন ব্যঞ্জনাদি, করণ হস্ত দন্তাদি। ইহারা তো ঐ সমস্ত ক্রিয়ার কর্তা নহে। সুতরাং ভোগক্রিয়ার অপর কেহ কর্তা হইবে। যে কর্তা সেই জীব বা জীবাত্মা।

গুণ

সাধারণতঃ দোষের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপেই গুণশব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহাতে গুণের শ্রেণিসংখ্যা অনেক অধিক হয়। ন্যায়-বৈশেষিক মতে কতিপয় বিশেষ বস্তুকেই 'গুণ' বলা হয়। এইসকল গুণ কেবল দ্রব্যেই থাকে অন্য কোনো পদার্থে থাকে না। ইহারা চব্বিশ প্রকার—
১. গন্ধ, ২. রস, ৩. রূপ, ৪. স্পর্শ, ৫. শব্দ, ৬. পরিমাণ, ৭. সংখ্যা, ৮. সংযোগ, ৯. বিভাগ, ১০. পৃথক্ত্ব, ১১. গুরুত্ব, ১২. দ্রবত্ব, ১৩. পরত্ব, ১৪. অপরত্ব, ১৫. স্নেহ, ১৬. সুখ, ১৭. দুঃখ, ১৮. ইচ্ছা, ১৯. দ্বেষ, ২০. যত্ন, ২১. জ্ঞান, ২২. সংস্কার, ২৩. ধর্ম, ২৪. অধর্ম।

১. গন্ধ ॥ গন্ধ অনুভবসিদ্ধ। ইহা কেবল পৃথিবীর গুণ। জল প্রভৃতি অষ্টবিধ দ্রব্যের কোনোটিতেই গন্ধ স্বীকৃত হয় না। সময়বিশেষে

জলে ও বায়ুতে গন্ধ অনুভূত হয়, সত্য ; ন্যায় মতে ঐ গন্ধ সেইসকল জল ও বায়ুতে সূক্ষ্মভাবে মিশ্রিত পার্থিব অণুরই গুণ। সূক্ষ্মতাবশতঃ পার্থিব অণুগুলি প্রত্যক্ষ হয় না, তাই জল কিংবা বায়ু উহার আশ্রয়-রূপে প্রতীত হয়। গন্ধ উৎকট না হইলে নাসিকা দ্বারা গ্রহণযোগ্য হয় না। কোনো পার্থিব দ্রব্যে গন্ধ অনুভূত না হইলে ও উহাতে অতি মৃদু গন্ধের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। সকল গন্ধই অনিত্য।

২. রস॥ রসও গন্ধের মত প্রত্যক্ষসিদ্ধ। মধুর অম্ল তিক্ত লবণ কটু ও কষায় ভেদে রস ছয় প্রকার। ষড়্‌বিধ রসই বিভিন্ন পার্থিব দ্রব্যে থাকে। জলে কেবল মাধুর্য রসই স্বীকৃত হয়। সুতরাং রস পৃথিবী ও জল এই উভয় দ্রব্যের গুণ। তেজঃপ্রভৃতি সপ্তবিধ দ্রব্যে কোনো প্রকার রসের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। জলীয় পরমাণুর রস নিত্য। অপরসকল রস অনিত্য।

৩. রূপ॥ এই তৃতীয় গুণটি বুঝাইতে ভাষায় 'বর্ণ' ও 'রঙ' শব্দের ব্যবহার বহু স্থানে দেখা যায়। শ্বেত রক্ত পীত কৃষ্ণ নীল ও হরিৎ এই ছয় শ্রেণীতে রূপের বিভাগ করা হইয়াছে। অবশ্য, এই ছয় শ্রেণীরও অবান্তর বিভাগ আছে। যেমন, শ্বেত-রূপ ভাস্বর এবং অভাস্বর ভেদে দ্বিবিধ। ভাস্বর শ্বেত-রূপ তেজোদ্রব্যের এবং অভাস্বর শ্বেত-রূপ জলের গুণ। অন্য সকল প্রকার রূপই পৃথিবীর গুণ। সুতরাং রূপ পৃথিবী জল ও তেজোদ্রব্যের গুণ। অন্য কোনো দ্রব্যে রূপ স্বীকৃত হয় না। জল-পরমাণু এবং তেজঃপরমাণু সমূহের রূপ নিত্য। অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে রূপ অনিত্য। প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা কেহ কেহ উল্লিখিত ছয় প্রকার ব্যতীত চিত্ররূপ নামে একপ্রকার পৃথক্ রূপের অস্তিত্ব মানিয়াছেন। হরিণ ময়ূর পারাবত নীলবৃষ প্রভৃতি চিত্র রূপের উদাহরণ।

৪. স্পর্শ॥ শীতল ও উষ্ণ এই দ্বিবিধ স্পর্শ সর্বসাধারণের

অনুভবসিদ্ধ। শীতলস্পর্শ জলের এবং উষ্ণস্পর্শ সূর্য অগ্নি প্রভৃতি তেজোদ্রব্যের গুণ। এতদ্ব্যতীত অনুষ্ণাশীত অর্থাৎ উষ্ণও নহে শীতলও নহে, এইরূপ এক প্রকার স্পর্শ পৃথিবী ও বায়ুতে স্বীকৃত হয়। এই তৃতীয় প্রকারের স্পর্শ প্রায়শঃ জলের শীতল স্পর্শ কিংবা তৈজসের উষ্ণ স্পর্শ দ্বারা অভিভূত থাকায় উহার অনুভব তেমন স্পষ্ট নহে। এই প্রকারে স্পর্শ-গুণ তিন ভাগে বিভক্ত এবং পৃথিবী জল তেজঃ এবং বায়ুর গুণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। আকাশ প্রভৃতি অন্য কোনো দ্রব্যে স্পর্শ-গুণ নাই। জল-পরমাণু, তেজঃপরমাণু ও বায়ু-পরমাণুর স্পর্শ নিত্য, অন্য সকল স্পর্শ অনিত্য।

৫. শব্দ ॥ যে-গুণ কর্ণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ হয় তাহাই শব্দ। ইহা কেবল আকাশের গুণ। অন্য কোনো দ্রব্য শব্দের উপাদান বা সমবায়িকারণ হইতে পারে না বলিয়াই আকাশ নামে পঞ্চমদ্রব্য ন্যায়মতে স্বীকৃত হয়। বর্ণ ও ধ্বনিভেদে শব্দ দুইপ্রকার। ক খ ইত্যাদি যেসকল শব্দ অর্থবিশেষের জ্ঞান জন্মায় তাহা বর্ণাত্মক শব্দ। মেঘগর্জন কামান বন্দুকের শব্দ বাদ্যধ্বনি এইসকল ধ্বনি শব্দ। সকল শব্দই অনিত্য। প্রত্যেক শব্দই ক্ষণিক। যে-ক্ষণে যে-শব্দ উৎপন্ন হয় তাহার পরবর্তী ক্ষণ পর্যন্ত থাকিয়া তৎপরক্ষণে সেই শব্দ নষ্ট হয়। কিন্তু অন্ত্যশব্দসকল উৎপত্তির পরক্ষণেই নাশপ্রাপ্ত হয়।

মীমাংসকেরা বলেন, শব্দ দ্রব্যজাতীয় পদার্থ। ইহা ক্রিয়াশীল, গমনসমর্থ। এজন্য বহু দূর হইতে কোনো লোক কথা বলিলে তাহার শব্দ বিদ্যুৎ-আকারে টেলিফোনযন্ত্রে আসিয়া পুনরায় শব্দে রূপান্তরিত হয় এবং ঐ শব্দ 'রিসিভার'ধারীর কানের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই প্রণালী অনুসারে দূরস্থিত বক্তার শব্দই শুনা যায়। নৈয়ায়িকদিগের পদ্ধতি অন্যরূপ। তাঁহারা বলেন, আলোড়িত জলে প্রথম একটি তরঙ্গ জন্মিলে সেই তরঙ্গ হইতে ক্রমে ক্রমে আরও অনেক তরঙ্গ যেরূপে

বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয় সেই প্রকার দূরস্থ বক্তার কণ্ঠস্বর তাহার ওষ্ঠ সন্নিহিত আকাশ হইতে শ্রোতার কর্ণকুহর পর্যন্ত সমস্ত আকাশপথে ক্রমিক শব্দধারা সৃষ্টি করে। মধ্যবর্তী শব্দসমূহ অশ্রুত অবস্থায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কেবল কর্ণবিবরে উৎপন্ন শব্দই শুনা যায়। সুতরাং কোনো ব্যক্তির কণ্ঠস্বরই অপরের কর্ণে প্রবেশ করে না।

বক্তার উচ্চারিত শব্দ এবং শ্রোতার কর্ণবিবরপ্রবিষ্ট শব্দে কার্য-কারণ ভাব সম্বন্ধ থাকায় ধ্বনির সাদৃশ্য ঘটে। এ জন্য যে-শব্দ যাহার কর্ণে প্রবেশ করে সেই শব্দশ্রেণীর মূলশব্দের উৎপাদক ব্যক্তিকেই সে শ্রুতশব্দের বক্তা বলিয়া ব্যবহার করে। অতএব কোনো ব্যক্তির কণ্ঠস্বর সাক্ষাৎ কর্ণে প্রবেশ না করায় 'আজ অমুকের কথা শুনিলাম' এই ব্যবহার কখনও মুখ্য হইতে পারে না, ইহা ঔপচারিক ব্যবহার।

রেডিয়ো-যন্ত্র খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর এক অপূর্ব আবিষ্কার। এই যন্ত্রও শব্দ বিষয়ে ন্যায়সিদ্ধান্তই সমর্থন করে। কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট স্থান বিশেষে রেডিও-যন্ত্রের সম্মুখে বসিয়া যাহা বলে, বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মধ্যস্থতায় বিভিন্ন স্থানের দূর ও নিকটস্থ লোকেরা একই সময় তাহা শুনিতে পায়। ব্যবহারের মুখ্যতা উপপাদনের জন্য 'শব্দ মনের ন্যায় দ্রুতগতিশীল দ্রব্য' এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে বিভিন্ন দেশস্থ লোকের কর্ণে একই শব্দের যুগপৎ প্রবেশ সম্ভবে না।

৬. সংখ্যা॥ সংখ্যা পরিমাণ সংযোগ বিভাগ ও পৃথক্ত্ব এই পাঁচটি সামান্য গুণ। ইহারা প্রত্যেক দ্রব্যেই থাকে। সংখ্যা-গুণ গণনা নির্বাহ করে। অন্য কোনো প্রকার গুণের দ্বারা এই গণনা কার্য নিষ্পন্ন হয় না। একত্ব দ্বিত্ব ত্রিত্ব ইত্যাদি ভেদে সংখ্যা বহুবিধ। প্রত্যেক দ্রব্যেরই স্বাভাবিক সংখ্যা একত্ব। নিত্যদ্রব্য সকলের একত্ব-সংখ্যা নিত্য। অনিত্য দ্রব্যের একত্ব অনিত্য। দ্বিত্বপ্রভৃতি সকল সংখ্যাই অনিত্য। দ্বিত্বের আশ্রয়দ্রব্য দুইটি। ত্রিত্বের আশ্রয়-দ্রব্য তিনটি। এই প্রকারেই

সর্বত্র সংখ্যার আশ্রয় স্থির হয়। একটি রূপ, দুইটি ক্রিয়া, তিনটি জাতি এইপ্রকারে যদিও দ্রব্য ব্যতীত গুণ ক্রিয়া সামান্য প্রভৃতিরও গণনা প্রচলিত আছে তথাপি ন্যায়মতে সংখ্যা-গুণ সমবায়সম্বন্ধে কেবল দ্রব্যেই স্বীকৃত হয়। উল্লিখিত উদাহরণসমূহে সংখ্যার সহিত গুণ ক্রিয়া প্রভৃতির সম্বন্ধ অন্যপ্রকার, সমবায় নহে।

৭. পরিমাণ॥ গণনার জন্য সংখ্যাগুণের ন্যায় ছোট বড় দীর্ঘ প্রস্থ ইত্যাদি ব্যবহারের জন্য পরিমাণ-নামে সপ্তম গুণের অস্তিত্বও স্বীকার করা আবশ্যক। অণুত্ব হ্রস্বত্ব মহত্ত্ব ও দীর্ঘত্ব বা দৈর্ঘ্য এই চতুর্বিধ পরিমাণই প্রচলিত সিদ্ধান্ত। পরমাণুসকলে একবিধ মাত্র পরিমাণ, উহা অণুত্ব বা পরমাণুত্ব, ইহা নিত্য। দ্ব্যণুকের পরিমাণ দ্বিবিধ— অণুত্ব ও হ্রস্বত্ব; ইহারা অনিত্য। আকাশ দিক্ কাল ও আত্মা ইহাদের একবিধমাত্র পরিমাণ মহত্ত্ববিশেষ বা পরমমহত্ত্বসংজ্ঞায় প্রসিদ্ধ। ইহা নিত্য। এতদ্ব্যতীত অপর সকল দ্রব্যে মহত্ত্ব ও দীর্ঘত্ব নামে যে দ্বিবিধ পরিমাণ স্বীকৃত হয় তাহা অনিত্য।

৮. সংযোগ॥ সংযোগ পৃথক্-অবিস্থিত দ্রব্য দ্বয়ের মিলন। ইহা প্রত্যেক দ্রব্যে থাকে। রূপ প্রভৃতি গুণ হইতে ইহার দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রত্যেক দ্রব্যের রূপ কেবল ঐ দ্রব্যেই থাকে, অন্য দ্রব্যের সহিত উহার কোনো সম্পর্ক নাই এবং সেই রূপটি একমাত্র অর্থাৎ কোনো দ্রব্যে একাধিক রূপ স্বীকৃত হয় না; সংযোগ কিন্তু দুইটি দ্রব্য ব্যতীত আত্মলাভেই সমর্থ হয় না এবং প্রত্যেক দ্রব্যেই বহু সংখ্যক সংযোগ থাকে। একটি গাছে মূলদেশে মাটির সহিত, মধ্যভাগে লতাদির সহিত, শাখাদিতে পক্ষিপ্রভৃতির সহিত সংযোগ হয়। তদ্ব্যতীত বায়ু আকাশ দিক্ কাল অসংখ্য আত্মা ও ইতস্তত সঞ্চরণশীল ধূলিকণাদির সহিত উহার যে সংযোগ ঘটে তাহা গণনার বহির্ভূত। সকল সংযোগই অনিত্য। ইহা প্রধানতঃ সম্বন্ধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৯. বিভাগ ॥ বিভাগ সংযোগের বিপরীতগুণ। মিলিত দ্রব্যদ্বয়ের পৃথক্ অবস্থানই বিভাগ। বিভাগ বশতঃপূর্বসংযোগ বিনষ্ট হয়। কিন্তু সংযোগবিনাশই বিভাগ নহে। বিভাগও সংযোগের ন্যায় দুইটি দ্রব্য আশ্রয় করিয়া থাকে এবং অনিত্য।

১০. পৃথকত্ব ॥ লতাবেষ্টিত বৃক্ষ লতা হইতে বিভক্ত নহে কিন্তু লতা হইতে পৃথক্। 'এই দ্রব্য ঐ দ্রব্য হইতে পৃথক্' এই প্রকার ব্যবহার দ্বারা পৃথক্ত্ব-গুণ কল্পিত হয়। ইহা সংখ্যা-গুণের তুল্য। অতএব এক-পৃথক্ত্ব দ্বিপৃথক্ত্ব ত্রিপৃথক্ত্ব ইত্যাদি ভেদে পৃথক্ত্ব বহুবিধ বিভাগে। পৃথক্ত্ব গুণের অন্তর্গত নহে, ইহা অভাববিশেষ মীমাংসকেরা এই মতবাদ বিশেষভাবে সমর্থন করিয়াছেন।

১১. গুরুত্ব ॥ রতি মাষা সের মণ ইত্যাদি সকল প্রকার ওজন বা মাপ কার্যের জন্য 'গুরুত্ব' নামে এই একাদশ গুণ স্বীকৃত হয়। সংখ্যা বা পরিমাণ-দ্বারা ওজনক্রিয়া নির্দোষভাবে সম্পন্ন করা যায় না। গুরুত্ব-গুণ প্রত্যক্ষযোগ্য নহে কিন্তু অত্যধিক অভ্যাসের ফলে গুরুত্ব-গুণের অনুমান আমাদিগের নিকট প্রত্যক্ষবৎ সরল ও দৃঢ় বিশ্বাসযোগ্য হইয়া থাকে। দাঁড়িতে লম্বিত দুই পাল্লার একটিতে সের রাখিয়া অন্য পাল্লায় চাউল রাখিলে যদি দাঁড়ির উভয় প্রান্ত সমসূত্রে থাকে তবে উভয়ের গুরুত্ব সমান প্রতীত হয়; আর উহা সমসূত্রে না থাকিলে যে-প্রান্ত নিম্ন সেই দিকের পাল্লার বস্তু ওজনে বেশি এবং অন্য পাল্লাস্থ বস্তুর ওজন কম ইহা শিশুরাও বুঝে। গুরুত্বগুণের এই জ্ঞান অনুমান, প্রত্যক্ষ নহে। 'অনুমান ব্যতীত সংসারযাত্রা নির্বাহ হয় না' এই শাস্ত্রবাক্যের ইহা একটি উত্তম নিদর্শন।

গুরুত্ব পৃথিবী এবং জলের গুণ। অন্য কোনো দ্রব্যে গুরুত্ব স্বীকৃত হয় না। ন্যায়মতে স্বর্ণ তৈজস বস্তু; পার্থিব কিংবা জল নহে; তথাপি উহার ওজন দেখা যায়। কাচপাত্র কিংবা খেলিবার বল বায়ুশূন্য

করিয়া একবার ওজন করতঃ পরে উহা বায়ুপূর্ণ করিয়া ওজন করিলে ওজন বৃদ্ধি অনুভূত হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে বায়ুরও গুরুত্ব আছে ইহা স্বীকার না করিয়া গুরুত্ব বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করা কঠিন। স্বর্ণের সহিত সূক্ষ্ম পার্থিব কণার এবং বায়ুর সহিত অতি সূক্ষ্ম পার্থিব কিংবা জলকণার অবিশ্লেষণীয় মিশ্রণ স্বীকার করিয়া এই সকল ক্ষেত্রে নৈয়ায়িকদিগকে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে হয়।

পরমাণু সমুদায়ের গুরুত্ব নিত্য, অন্যসকল গুরুত্ব অনিত্য।

১২. দ্রবত্ব॥ দ্বাদশ গুণ দ্রবত্বের অন্য সকল গুণ হইতে বৈলক্ষণ্য অতিশয় স্পষ্ট। দ্রবত্ব প্রায়শঃ কাঠিন্যের বিপরীত আকারে প্রকাশ পায়। লোহ স্বভাবতঃ কঠিন। অধিক উত্তাপে লোহও জলের মত তরল হইয়া থাকে। এই তারল্যই দ্রবত্ব। জলের দ্রবত্ব সাংসিদ্ধিক বা সহজাত। ঘৃত মোম প্রভৃতি পার্থিব কোনো কোনো দ্রব্যেও উত্তপ্ত অবস্থায় দ্রবত্ব অনুভূত হয়। এই দ্রবত্বের নিমিত্ত বা কারণ তেজঃসংযোগ। এজন্য ইহা নৈমিত্তিক দ্রবত্ব। তেজঃপদার্থ স্বর্ণেও নৈমিত্তিক দ্রবত্ব দৃষ্ট হয়। বায়ু প্রভৃতি অপর ছয় দ্রব্যে দ্রবত্ব গুণ স্বীকৃত হয় না। জল পরমাণু ব্যতীত অন্য দ্রব্যের দ্রবত্ব অনিত্য।

১৩-১৪. পরত্ব, অপরত্ব॥ পরত্ব-গুণ দ্বিবিধ: কালিক বা কালকৃত এবং দৈশিক বা দিক্কৃত। 'বয়সে বড়' এই প্রকার ব্যবহার সিদ্ধির জন্য যে গুণ অপেক্ষিত হয় তাহা কালিক পরত্ব। সমসাময়িক দ্রব্যদ্বয়ের মধ্যে যেটি পূর্বে উৎপন্ন হয় তাহাতে অন্যটির তুলনায় এই কালিক পরত্ব জন্মে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক। বঙ্কিম জন্মিয়াছিলেন অনেক বৎসর পূর্বে। তাই রবীন্দ্রনাথের তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্র বড় অর্থাৎ পরত্ব-গুণবিশিষ্ট, ইহা নিঃসন্দেহ।

পরত্ব গুণের ন্যায় অপরত্বও কালিক এবং দৈশিক ভেদে দ্বিবিধ। ইহার পরিচয়ও পরত্বের অনুরূপ। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের অনেক বৎসর

পরে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। সুতরাং বঙ্কিমের তুলনায় রবীন্দ্রনাথ বয়সে ছোট অর্থাৎ কালকৃত অপরত্ব-গুণবিশিষ্ট। কালিক পরত্ব ও অপরত্ব পরমাণু ব্যতীত পার্থিব জলীয় তৈজস ও বায়ব্য দ্রব্যে থাকে।

বস্তুর দূরত্ব ও নৈকট্য যথাক্রমে দিক্‌কৃত পরত্ব ও অপরত্বসংজ্ঞায় ব্যবহৃত হয়। কালিক পরত্ব ও অপরত্বের ন্যায় ইহারা দ্রব্যের নিয়ত ধর্ম নহে। এখন যে দ্রব্যটি আমি অন্য বস্তুর তুলনায় দূরস্থ বলিয়া মনে করি আমি স্বয়ং উহার নিকটে যাইতে পারি অথবা তাহা আমার নিকটে আসিতে পারে। তখন পূর্বের তুলনায় বস্তুটি নিকটবর্তী হইয়া পড়ে। রূপ, রস কিংবা অন্য কোনো গুণের দ্বারা উল্লিখিত দ্বিবিধ পরত্ব ও অপরত্বের ব্যবহার নির্দোষভাবে উপপন্ন করা যায় না। এজন্য এই প্রকার স্বতন্ত্র গুণ স্বীকৃত হয়। দিক্‌কৃত পরত্ব ও অপরত্ব আকাশ আত্মা দিক্‌ ও কাল ব্যতীত সমস্ত দ্রব্যে থাকে।

১৫. স্নেহ॥ ইহা কেবল জলীয় দ্রব্যের গুণ। আটা প্রভৃতি চূর্ণদ্রব্য জল-সংযোগে যে পিণ্ডভাব প্রাপ্ত হয় উহার কারণ জলের এই স্নেহ-গুণ। তৈলাদি বস্তু বিশেষের অভ্যন্তরে জলের যেসকল সূক্ষ্ম কণা থাকে তাহাতে বিশেষভাবে স্নেহ বিদ্যমান। স্নেহ জল-পরমাণুতে নিত্য অন্যত্র অনিত্য।

১৬. সুখ॥ সুখ সকল জীবের অনুভবসিদ্ধ। ইহা সকলেরই কাম্য।

১৭. দুঃখ॥ দুঃখও সুখের ন্যায় অনুভবসিদ্ধ বটে, তবে ইহা কাহারও প্রার্থনীয় নহে কিন্তু প্রতিকূল বা দ্বেষের বিষয়। তাই সকলে দুঃখ পরিহার করিতে চাহে। এজন্য দুঃখনিবৃত্তি ও সুখ উভয়ই সকল কার্যের মুখ্য প্রয়োজন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। সুখ ও দুঃখ জীবাত্মার গুণ।

১৮. ইচ্ছা॥ ইচ্ছা-গুণ সকলেরই পরিচিত। ইচ্ছা বুঝাইতে

শাস্ত্রকারেরা অনেক স্থলে 'কাম' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। তবে মৈথুনেচ্ছা অর্থেই 'কাম' শব্দের প্রয়োগ সমধিক। এইরূপ বিষয়ভেদ বশতঃ বিভিন্ন ইচ্ছাগুলিও পৃথক্ পৃথক্ নামে প্রসিদ্ধ। ভাবী বস্তু নিষ্পাদনের ইচ্ছা— সংকল্প; পরবঞ্চনেচ্ছা— কাপট্য; দোষ দর্শনবশতঃ ত্যাগেচ্ছা— বৈরাগ্য ইত্যাদি। ইচ্ছা জীবাত্মা ও ঈশ্বর উভয়ের গুণ।

১৯. দ্বেষ॥ ইচ্ছার ন্যায় দ্বেষও প্রসিদ্ধ। দুঃখ দ্বেষের প্রধান বিষয়। ফলে যাহার নিকটে যে-বস্তু দুঃখজনক সেই বস্তুই তাহার পক্ষে দ্বেষ্য বা দ্বেষের বিষয়। ক্রোধ ঈর্ষ্যা অসূয়া প্রভৃতি শব্দ দ্বেষ-গুণেরই বোধক। ইহা জীবের গুণ।

২০. যত্ন॥ ইচ্ছার সহিত যত্নের সম্বন্ধ খুব নিকট। প্রাণিশরীরে যে-সমুদায় স্পন্দন বা বিচলন হয় তাহার নাম চেষ্টা। এই চেষ্টার মূল ইচ্ছা ও যত্ন। তবে এমন অনেক বিষয় আছে যাহা ইচ্ছার বিষয়, তথাপি ঐজন্য কেহ চেষ্টা করে না। নিরন্তর বৃষ্টি চলিতে থাকিলে লোকে 'সূর্যোদয় হউক' এইরূপ ইচ্ছা করে কিন্তু ঐজন্য কেহ চেষ্টা করে না। যেহেতু যত্ন চেষ্টার মূল কারণ। ফলে যাহা যত্ন সাধ্য সেই বিষয়েই চেষ্টা হইয়া থাকে। সূর্যোদয় মানুষের কাম্য অথচ যত্ন সাধ্য নহে। তাই উহার জন্য চেষ্টা সম্ভবে না। ইহাতে ইচ্ছা ও যত্নগুণের স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যত্ন জীবাত্মাও ঈশ্বরের গুণ।

২১. জ্ঞান॥ বুদ্ধি উপলব্ধি চেতনা চৈতন্য বোধ ইত্যাদি শব্দে যাহা বুঝায় তাহাই জ্ঞান। ইহা জীবাত্মা ও ঈশ্বর উভয়ের গুণ। জ্ঞান দ্বিবিধ: অনুভবও স্মৃতি। অনুভব চতুর্বিধ: প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি এবং শাব্দবোধ। প্রত্যক্ষ ছয় প্রকার: ঘ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, ত্বাচ'বা' স্পার্শন, শ্রোত্রজ বা শ্রাবণ এবং মানস।

ঘ্রাণ অর্থাৎ নাসিকার দ্বারা গন্ধ সকল ও গন্ধগত বিশেষ ধর্মসমূহই

বুঝা যায়। অন্য কিছুই নাসিকার আয়ত্ত নহে। তাই কেবল গন্ধ এবং উহার বৈজাত্যগুলিই ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষের বিষয় নির্দিষ্ট হইয়াছে।

রসনা অর্থাৎ জিহ্বার সাহায্যে তিক্ত মধুর অম্ল কটু বা ঝাল ইত্যাদি রসের অনুভব হয়। ঐসময়ে গুড় শর্করা মধু প্রভৃতির মাধুর্যাদিগত বৈলক্ষণ্যও প্রকাশ পায়। সুতরাং বিভিন্ন প্রকারের রসসমূহ ও উহাদের বৈজাত্য রাসন-প্রত্যক্ষের বিষয়।

চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়: রূপ রূপবিশিষ্ট দ্রব্য, ঐপ্রকার দ্রব্য এবং রূপগত বৈজাত্য, কর্ম (৩য় পদার্থ) পৃথক্ত্ব, সংখ্যা সংযোগ, বিভাগ পরত্ব ও অপরত্ব (দিক্কৃত) স্নেহ, দ্রবত্ব, পরিমাণ, সমবায় এবং চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ যোগ্যবস্তুর অভাব।

ত্বাচ প্রত্যক্ষের বিষয়— স্পর্শ, স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্য। এতদ্ব্যতীত যে সকল পদার্থ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে রূপ এবং রূপগত জাতি ভিন্ন সেই সমস্ত বস্তু ও ত্বাচ-প্রত্যক্ষের বিষয়।

শ্রাবণ প্রত্যক্ষের বিষয়— শব্দ এবং শব্দগত জাতি।

প্রত্যেক জীবাত্মা এক একটি মন বিশিষ্ট এক একটি দেহে অধিষ্ঠিত। প্রত্যেক মন ঐদেহের অধিষ্ঠাতা জীবাত্মা এবং সেই জীবাত্মায় অবস্থিত সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ যত্ন জ্ঞান এই কয়টি গুণ এবং ঐসকলে বিদ্যমান জাতি বিষয়ে প্রত্যক্ষ জন্মায়। সুতরাং উহারা মানস প্রত্যক্ষের বিষয়।

উল্লিখিত বিষয় নির্দেশ কেবল লৌকিক প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেই। অলৌকিক প্রত্যক্ষ, অনুমিতি এবং শাব্দবোধে সকল পদার্থই বিষয় হইতে পারে।

অনুমিতি— পরামর্শ হইতে যে জ্ঞান জন্মে তাহা অনুমিতি। ইহার বিবরণ পরে পাওয়া যাইবে।

উপমিতি— ইহা উপমান প্রমাণের ফল। ইহার দ্বারা পদ বিশেষের শক্তি জ্ঞান জন্মে। গো-সদৃশ জন্তু বিশেষ গবয়পদের শক্য (শক্তিলভ্য

অর্থ) এই প্রকার উপদেশ প্রাপ্ত কোনও ব্যক্তি পশুশালায় উপস্থিত হইয়া একটি গো-সদৃশ জন্তু দেখিল। তখনই উক্ত উপদেশ স্মরণ হওয়ায় সে বুঝিল এই জন্তুটিই গবয় (গবয়পদের অর্থ)। এই প্রকার জ্ঞানই উপমিতি।

শাব্দবোধ— ইহাই বাক্যার্থ বোধ। বাক্য পদসমষ্টি। বাক্য শ্রবণের পরে উহার অর্থবিষয়ে যে জ্ঞান জন্মে তাহা শাব্দবোধ।

যাহা পূর্বে অনুভূত অর্থাৎ কোনও অনুভবে বিষয়ীভূত হইয়াছে সময়ান্তরে তদ্বিষয়ে স্মৃতি বা স্মরণ জন্মে।

২২. সংস্কার ॥ সংস্কার তিন প্রকার: বেগ, স্থিতিস্থাপক এবং ভাবনা।

বেগ (speed) ইহা পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও মনের গুণ।

স্থিতিস্থাপক— ইহা কেবল পৃথিবীর গুণ। কেহ বলেন ইহা জল তেজ এবং বায়ুতেও বিদ্যমান। বৃক্ষের শাখা নীচের দিকে আকর্ষণ করিয়া ছাড়িয়া দিলে উহা যে আপনা হইতেই পূর্বস্থানে পৌছে তাহার হেতু ঐ শাখার স্থিতিস্থাপক গুণ।

ভাবনা— ইহা জীবাত্মার গুণ। ভাবনা অর্থেই সংস্কার শব্দ সমধিক প্রসিদ্ধ। পূর্বে যে-ব্যক্তি যে-বস্তু যে প্রকারে অনুভব করে ঐ অনুভব ঠিক তদ্রূপে সেই বস্তুর একটি ছাপ তাহার আত্মায় স্থায়িভাবে রাখিয়া যায়। উহারই নাম ভাবনা। সদৃশ বস্তু দর্শন ইত্যাদি উদ্বোধক উপস্থিত হইলে ভাবনা নিজের তুল্যাকারে স্মৃতি উৎপাদন করে।

২৩-২৪. ধর্ম ও অধর্ম ॥ ধর্ম 'পুণ্য' নামে এবং অধর্ম 'পাপ' নামে প্রসিদ্ধ। এ দুইটিও জীবাত্মার গুণ। পুণ্যের ফলে স্বর্গভোগ এবং পাপের ফলে নরকভোগ হয় ইহা অনেকেই বিশ্বাস করেন। যে দেহে যে রূপ পুণ্যকর্ম কিংবা যে প্রকার পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হয় তদনুসারে স্বর্গ বা নরক ভোগ সেই দেহেই হয় না। কর্তা মৃত্যুর পরে নূতন দেহ ধারণ করিয়াই

স্বর্গ ও নরক ভোগ করেন। সুতরাং স্বর্গ নরক মানিতে হইলে জন্মান্তরবাদ অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। এমতে দেহাতিরিক্ত চিরস্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব অপরিহার্য।

পুণ্যকর্ম— গঙ্গাস্নান দান জপ যজ্ঞাদি, এবং পাপকর্ম—চৌর্য সুরাপান ইত্যাদি স্বর্গ ও নরক ভোগের বহু পুর্বে ঘটে। সুতরাং স্বর্গ-নরক ভোগস্বরূপ ফলোৎপত্তির পুর্বে বর্তমান না থাকায় উহাদিকে ঐ প্রকার কার্যে কারণ বলা সম্ভবে না। অথচ ঐক্ষেত্রে উহাদের কারণত্ব লোকসিদ্ধ এবং শাস্ত্রসম্মত। তাই গঙ্গাস্নানাদি কর্মের স্বর্গ-কারণত্ব এবং চৌর্য প্রভৃতির নরকহেতুত্ব উপপাদনের জন্য মধ্যবর্তী কারণ রূপে ধর্মও অধর্ম কল্পিত হয়। উক্ত গুণদ্বয় দীর্ঘকাল স্থায়ী। তাই ফলোৎপত্তির অব্যবহিত পুর্বকালেও বিদ্যমান থাকায় কোনো অনুপপত্তি হয় না।

কর্ম

নির্দেশক্রমে কর্ম তৃতীয় পদার্থ। ইহা স্পন্দন এবং কম্পন নামেও পরিচিত।

সামান্য

চতুর্থ পদার্থ সামান্য একশ্রেণীয় বস্তুর সাধারণ ধর্ম। যেমন মনুষ্যত্ব গোত্ব অশ্বত্ব ইত্যাদি। নব্য নৈয়ায়িকেরা এই সব ধর্মকে জাতি নামেও নির্দেশ করেন। গোত্ব অশ্বত্ব প্রভৃতি ঐ সমুদায় জন্তুর বিভিন্ন আকৃতির দ্বারা ব্যক্ত হয়। ন্যায়সম্মত সকল জাতিই পৃথক্ আকৃতির দ্বারা ব্যক্ত হইবে এরূপ নিয়ম নাই। অনেক স্থলে ব্যঙ্গ্য জাতি এক কিন্তু উহার ব্যঞ্জক আকার নানাবিধ। যেমন দ্রব্যত্ব। ইহা নয় প্রকার দ্রব্যেই থাকে অথচ সকল দ্রব্যের আকৃতি একরূপ নহে। সত্ত্ব দ্রব্যত্ব গুণত্ব কর্মত্ব ইত্যাদি ভেদে জাতি অসংখ্য। দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম ব্যতীত অপর কোনো পদার্থে জাতি স্বীকৃত হয় না।

বিশেষ

নির্দেশানুসারে বিশেষ পঞ্চম পদার্থ। ইহা প্রত্যক্ষের বহির্ভূত, কেবল যুক্তিগম্য। প্রত্যেক নিত্য দ্রব্যে এক-একটি বিশেষ-পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়।

সমবায়

ষষ্ঠ পদার্থ সমবায় একটি সম্বন্ধবিশেষ। এই শাস্ত্রে উল্লিখিত বহুপ্রকার সম্বন্ধের মধ্যে সংযোগের পরিচয় পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। একটু প্রণিধান করিলেই সংযোগ হইতে সমবায়ের পার্থক্য বুঝা যায়। তন্তু সমূহ পরস্পর সংযোগবশতঃ বস্ত্র উৎপন্ন করে। সর্বত্রই দেখা যায় প্রত্যেকটি সংযোগের জন্য দুইটি মাত্র দ্রব্য অপেক্ষিত। বস্ত্র ও সূত্র পৃথক্ বলিয়া লোকসিদ্ধ। তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি বস্ত্রের সহিত উহার কারণ তন্তুসমূহের সম্বন্ধ কি? ইহা সংযোগ নহে। কারণ, একটি বস্ত্র সকল তন্তুতে বিদ্যমান। সংযোগ স্থলে সংযুক্ত বস্তুদ্বয়ের পৃথক্‌ভাবে অবস্থান সম্ভবে। বস্ত্র ও তন্তুর সম্বন্ধ যদি সংযোগ হইত তবে তন্তুসমূহ বিশ্লিষ্ট হইলেও বস্ত্র বিদ্যমান থাকিত। অতএব এই সম্বন্ধ সংযোগ নহে। এই বিলক্ষণ সম্বন্ধই সমবায়। এই সমবায় সম্বন্ধেই অবয়বী সকল স্ব স্ব অবয়বে, গুণ ও কর্ম সমুদায় দ্রব্যে, জাতি সকল—স্ব স্ব আশ্রয় দ্রব্য, গুণ এবং কর্মে বিশেষ সমূহ নিত্য দ্রব্যে সম্বদ্ধ।

অভাব

অভাব সপ্তম পদার্থ। ন+ভাব=অভাব, এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা বুঝা যায় এই সপ্তম পদার্থ উল্লিখিত ছয় প্রকার ভাব পদার্থের বিরোধী কিছু। সুতরাং অভাব-সংজ্ঞা হইতে ঐ 'কিছু'র স্বরূপ স্পষ্ট হয় না; যেন কোনো অংশে কিছু প্রচ্ছন্ন রহিয়া যায়।

ঘটাভাব গুণাভাব কর্মাভাব ইত্যাদি যেসমস্ত অভাব ন্যায়শাস্ত্রে উল্লিখিত, উহাদের কোনোটিই কথিত ছয় প্রকার ভাবপদার্থের বিরোধী নহে। কিন্তু ঘটাভাব কেবল ঘটের, গুণাভাব কেবল গুণ-পদার্থের এবং কর্মাভাব একমাত্র ক্রিয়া বা স্পন্দনের বিরোধী। অপর অধিকাংশ ভাবপদার্থের সহিত উহাদের বিরোধ না থাকায় শুদ্ধ (অর্থাৎ বস্তু বিশেষ বোধক ঘট গুণ ইত্যাদি পদের সমভিব্যাহার না থাকিলে) 'অভাব' শব্দ কোনো অর্থই যেন পরিষ্কার রূপে প্রকাশ করিতে পারে না। 'অভাব' এই যৌগিক শব্দ পরিহার করিয়া 'নিষেধ' এই রূঢ়শব্দ ব্যবহার করিলে লক্ষ্যস্থল অধিক স্পষ্ট হইতে পারে। তাহাতে ঘটাভাব-শব্দের অর্থ-হইবে ঘটস্বরূপ ভাবের নিষেধ। বস্তুতঃ নিষেধ হইলেই উহার বিরোধী বা প্রতিযোগিরূপে কোনো ভাবপদার্থ উপস্থিত হইবে ইহাই নিয়ম। তাই যে নিষেধের বিরোধী অর্থাৎ প্রতিযোগী ঘট তাহাই ঘটাভাব।

অভাব চতুর্বিধ : অত্যন্তাভাব, অন্যোন্যাভাব, প্রাগভাব এবং ধ্বংস।

অত্যন্তাভাব— সাধারণতঃ ইহা 'নাই' এইশব্দের অর্থ। যেমন গাছে ফল নাই = বৃক্ষে ফলাভাব, কূপে জল নাই = জলাভাব ইত্যাদি।

অন্যোন্যাভাব— ভিন্ন, নয়, নহে এইপ্রকার শব্দ হইতে অন্যোন্যাভাব প্রতীত হয়। ইহার প্রসিদ্ধ সংজ্ঞান্তর ভেদ। রাম শ্যাম হইতে ভিন্ন = শ্যামের অন্যান্যাভাব। দ্রব্য গুণ নহে = গুণান্যোন্যাভাব বা গুণভেদ। নহ মাতা নহ কন্যা—মা নও মেয়ে নও = মাতৃভেদ কন্যাভেদ ইত্যাদি।

প্রাগভাব— নিষেধ স্বরূপ হইলেও প্রাগভাব বুঝাইতে ন (নঞ) শব্দের অপেক্ষা থাকে না ; কিন্তু 'হইবে' ইত্যাদি শব্দের সাহায্যে ইহার প্রতীতি হয়। যে-পদার্থ ভবিষ্যৎকালে জন্মিবে, প্রাক্ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে ঐ কার্য বস্তুর উপাদানগত উহারই যে নিষেধ তাহাই ঐ বস্তুর প্রাগভাব। বস্ত্র উৎপন্ন হইবার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত সূত্রে বস্ত্রের যে নিষেধ

প্রতীত হয় উহা সূত্রে বস্ত্রপ্রাগভাব। 'এই সূত্রে বস্ত্র হইবে' ইত্যাদি প্রকারে প্রাগভাব বুদ্ধির বিষয় হয়। ঐ সময়ে তন্তু (বস্ত্রের উপাদান কারণ) ব্যতীত অন্যত্র বস্ত্রের অভাব প্রতীত হয় সত্য; তবে তাহা প্রাগভাব নহে, পরন্তু অত্যন্তাভাব। সৎকার্যবাদী সাঙ্খ্যসম্প্রদায় বলেন কার্যসকল উৎপত্তির পূর্বে উহাদের উপাদানকারণে সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান থাকে। কার্যের এই সূক্ষ্মবস্থা শক্তি এবং অতিশয় সংজ্ঞায় কথিত হয়। ইহার সহিত ন্যায়সম্মত এই প্রাগভাবের তুলনা করা যায়। প্রাগভাবের প্রতীতিও নঞ্‌পদনিরপেক্ষ ভাবাবভাসিনী ইহা চিন্তনীয়। সম্প্রদায় বিশেষ প্রাগভাবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

ধ্বংস

ধ্বংস প্রাগভাবের তুল্য অন্য প্রকার নিষেধ। ইহা স্বীয় প্রতিযোগী পদার্থের উৎপত্তির পরে উহারই উপাদান গত নিষেধ ইহা 'নাশ' এই প্রকারে প্রতীত হয়। বিনাশ প্রধ্বংস প্রভৃতি শব্দ এই চতুর্থ নিষেধকেই বুঝায়।

প্রমাণ প্রকরণ

জগৎ-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিলে যাহা কিছু পাওয়া যায় এবং উহা সৃষ্টির জন্য যাহা আবশ্যক সমস্তই উল্লিখিত সপ্ত পদার্থের অন্তর্গত। এই সকল পদার্থই প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে এবং অপর কোনো পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া অগণিত নাম ও রূপ ধারণ করে। ইহাতেই সমস্ত ব্যবহার সিদ্ধ হয়। ইহারাই ন্যায়শাস্ত্রের প্রমেয়।

প্রমাণের বিষয় এই জন্যই ইহাদের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। প্রাচীনেরা বলিয়াছেন—প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি। উল্লিখিত প্রমেয় সমুদায় কিরূপে কোন্ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় তাহা বুঝিতে হইলে প্রমাণ কি তাহা বুঝিতে হইবে।

প্রপূর্ব 'মা' ধাতু হইতে করণবাচ্যে অনট্ প্রত্যয় দ্বারা 'প্রমাণ' শব্দ নিষ্পন্ন হয় (প্র+মা+অনট্)। 'মা'ধাতুর অর্থ জ্ঞান। প্র-উপ সর্গের অর্থ প্রকর্ষ। জ্ঞানের পক্ষে প্রকর্ষ ভ্রান্তিশূন্যতা। অনট্-প্রত্যয়ের অর্থ করণ— কারণ বিশেষ। যাহার ব্যাপার বা কার্য হইলে কর্তা ক্রিয়া নিষ্পন্ন করেন সেই কারণকেই করণ সংজ্ঞা দেওয়া হয়। শস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিতেছে (শস্ত্রেণ ছিনত্তি) এইস্থলে দা কুঠার প্রভৃতি শস্ত্রের সহিত সংযোগ হইলেই বৃক্ষাদির ছেদন-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হওয়ায় শস্ত্র ছেদন ক্রিয়ায় করণ হইয়া থাকে। প্রকৃতস্থলে ভ্রান্তি শূন্য জ্ঞানে যাহা করণ তাহাই প্রমাণ-পদ বাচ্য। বিশেষ এই যে প্রমাণের অন্তর্গত এই প্রমা বা জ্ঞান অনুভূতি মাত্র, স্মৃতি নহে। পূর্বে বলা হইয়াছে অনুভূতি চারিপ্রকার : প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি এবং শাব্দবোধ। ফলস্বরূপ প্রমা বা জ্ঞানের এই প্রকার বৈচিত্র্য বশতঃ প্রমাণ ও প্রত্যক্ষপ্রমাণ, অনুমান-প্রমাণ, উপমান-প্রমাণ এবং শব্দ প্রমাণ বা শাব্দপ্রমাণ এই চতুর্বিধ সংজ্ঞায় বিভক্ত হয়।

প্রত্যক্ষ

অনুমিতি উপমিতি প্রভৃতি অন্য সকল প্রকার জ্ঞানের মূল প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষের সাহায্য ব্যতীত অন্যপ্রকার জ্ঞান জন্মিতেই পারে না এজন্য জ্ঞানসমূহের মধ্যে প্রত্যক্ষকে এবং প্রমাণ সকলের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণকে জ্যেষ্ঠ বলা যায়। ঘ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, ত্বাচ, শ্রাবণ ও মানস ভেদে প্রত্যক্ষ ছয় প্রকার। বিভিন্ন প্রকার প্রত্যক্ষের বিষয় প্রায়শঃ পূর্বেই বলা হইয়াছে[৬]। এতদ্ভিন্ন যাহা যে-ইন্দ্রিয়ের বিষয়, তাহার অভাবও সেই ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে।

উল্লিখিত ছয় প্রকার প্রত্যক্ষে যথাক্রমে নাসিকা জিহ্বা চক্ষু ত্বক্ কর্ণ এবং মন এই ছয় ইন্দ্রিয় করণ। যে হেতু ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইলেই ঐসমস্ত প্রত্যক্ষ নিষ্পন্ন হয় অতএব ঐসকল ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

অনুমিতি

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষের কারণ বটে, কিন্তু ঐ কারণ উপস্থিত হইলে সর্বত্রই যে বিষয়গুলির প্রত্যক্ষ হইবে এরূপ বলা যায় না। বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধ ব্যতীত প্রত্যক্ষের আরও অনেক কারণ আছে। সেই সমুদয় কারণ উপস্থিত হইলে এবং দূরত্ব ব্যবধান অভিভব প্রভৃতি দোষ না থাকিলে যে বিষয় প্রত্যক্ষযোগ্য তাহারই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এক জাতীয় বস্তুর মধ্যেই এমন বৈচিত্র্য দেখা যায় যে একটির প্রত্যক্ষ হয় কিন্তু অন্যটি চিরকাল অপ্রত্যক্ষই রহিয়া যায়। অগ্নির সংযোগ ব্যতীত কোনো বস্তুর পাক সম্ভবে না। চুল্লীস্থ অগ্নির প্রত্যক্ষ হয় কিন্তু কটাহাদির অন্তর্গত অগ্নি প্রত্যক্ষের বহির্ভূত। কটাহস্থ

৬ ২১ সংখ্যক গুণ দ্রষ্টব্য।

বস্তুর পক্কতা দেখিয়া উহার অভ্যন্তরস্থ অগ্নি বিষয়ে যে জ্ঞান হয় তাহা অনুমিতি; প্রত্যক্ষ নহে। সংসারযাত্রানির্বাহে অধিকাংশ কার্যই অনুমিতি দ্বারা সম্পাদিত হয়।

প্রত্যক্ষের বিষয় সম্বন্ধে বিচার করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় সপ্তবিধ প্রমেয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষের ক্ষেত্র কত অল্প। জ্যেষ্ঠ হইলেও ইহার তুলনায় বিষয়গৌরবে অনুমিতির শ্রেষ্ঠতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। কারণ, সকল প্রমেয়ই অনুমিতির বিষয় হইতে পারে।

অনুমিতি একজাতীয় বিশিষ্ট জ্ঞান। বিশিষ্টজ্ঞানমাত্রেই বিষয়গুলি বিশেষ্য-বিশেষণভাবে বা ধর্মধর্মিভাবে প্রকাশ পায়। যাহা বিশেষ্য বা ধর্মী অনুমিতিস্থলে তাহারই নাম পক্ষ, আর যাহা বিশেষণ বা ধর্ম তাহা সাধ্য নামে নির্দিষ্ট হয়। 'পর্বতো বহ্নিমান্' এইরূপ অনুমিতিস্থলে 'পর্বত' পক্ষ এবং 'বহ্নি' সাধ্য।

অনুমিতির স্বরূপ বুঝিবার জন্য পক্ষ ও সাধ্যের ন্যায় হেতুর জ্ঞানও আবশ্যক। দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োগানুসারে বলা যায়—যে পদে পঞ্চমী বিভক্তি থাকে সেই পদার্থই 'হেতু'। 'পর্বত বহ্নিমান্' এইরূপ প্রতিজ্ঞা বাক্যের পরে 'ধূমাৎ' এই প্রকার হেতু প্রয়োগ দ্বারা উহা সমর্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং ধূম-পদে পঞ্চমী বিভক্তি থাকায় এখানে ধূম-পদার্থ 'হেতু'। 'হেতু সাধ্যের ব্যাপ্য' (উল্লিখিত স্থলে ধূম বহ্নির ব্যাপ্য) এই প্রকারে হেতু-পদার্থে সাধ্যের ব্যাপ্তি বা অবিনাভাব-সম্বন্ধ জ্ঞানই ব্যাপ্তি-জ্ঞান। ইহাই অনুমিতির করণ। ব্যাপ্তিজ্ঞানের পরে 'পক্ষ সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্' (কথিত স্থলে 'পর্বত বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্') এই প্রকারে পক্ষে সাধ্যব্যাপ্যহেতুর অস্তিত্ব বিষয়ে যে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হয় তাহা পরামর্শ। পরামর্শ ব্যাপ্তিজ্ঞানের ব্যাপার। ইহার পরে 'পক্ষ সাধ্যবান্' (উক্ত স্থলে 'পর্বত বহ্নিমান্') এই প্রকারে যে জ্ঞান জন্মে তাহাই অনুমিতি।

অতএব দেখা যাইতেছে, অনুমান-প্রমাণ জ্ঞান বিশেষ, অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞান কিংবা পরামর্শস্বরূপ। ব্যাপ্তির নামান্তর অবিনাভাব-শব্দটির অর্থ পর্যালোচনা করিলে অনুমানের প্রামাণ্য সম্বন্ধে গূঢ়তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। বিনা— ব্যতিরেকে অর্থাৎ সাধ্যশূন্য স্থানে। ভাব— সত্তা, অস্তিত্ব বা থাকা। বিনা ভাব— সাধ্য ব্যতীত কোন স্থানে থাকা। অ বিনা ভাব— সাধ্য ব্যতীত কোনো স্থানে না থাকা। ফলে দাঁড়াইতেছে— যাহা সাধ্যশূন্য কোনও স্থানে না থাকে তাহাই সাধ্যের ব্যাপ্য। ধূম যদি বহ্নিশূন্য কোনো স্থানে না থাকে তবে উহা বহ্নির ব্যাপ্য। ভস্ম বহ্নির অপর ব্যাপ্য বস্তু। কারণ, অগ্নি ব্যতীত ভস্ম উৎপন্ন হয় না। সুতরাং ভস্মের উৎপত্তি স্থানে অগ্নির অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য।

হেতু যে-অবস্থায় ব্যাপ্য হইয়া যেখানে থাকে সেই ক্ষেত্রেই সাধ্যানুমিতি জন্মায় ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। ধূম ও ভস্ম উৎপত্তির জন্যই অগ্নির অপেক্ষা রাখে তাই উৎপন্নাবস্থায় উহারা অগ্নির ব্যাপ্য। অতএব উহাদিগের দ্বারা ঐ ক্ষেত্রেই যথার্থ অনুমান সম্ভব। দেশান্তরস্থ ধূম বা ভস্ম সেই স্থানে উৎপন্ন না হওয়ায় ঐ সকল স্থানে বহ্নির অস্তিত্ব নিয়মিত করিতে পারে না।

ব্যপ্তির ন্যায় পক্ষধর্মতা অর্থাৎ হেতুর পক্ষে অবস্থিতি ও অনুমিতির যথার্থতা সম্পাদন করে। সাধ্যের ব্যাপ্য কিন্তু পক্ষধর্ম (পক্ষে বিদ্যমান) নহে কিংবা পক্ষধর্ম কিন্তু সাধ্যের ব্যাপ্য নহে এইরূপ হেতুর দ্বারা অভ্রান্তভাবে সাধ্যের অনুমান করা যায় না। সুতরাং অনুমিতি ভুল অর্থাৎ ভ্রমাত্মক হইলে বুঝিতে হইবে সাধ্যের ব্যাপ্য এবং পক্ষস্থিত বলিয়া প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ ঐ হেতু-পদার্থে ব্যাপ্তি কিংবা পক্ষধর্মতা দুইয়ের একটি অথবা উভয়ই নাই। ব্যাপ্তি না থাকার অর্থই হইল হেতুর সাধ্য শূন্য কোনো স্থানে থাকা। যেহেতু সাধ্যশূন্য স্থানেও থাকে

বলিয়া জানা যায় তাহার অস্তিত্ব সাধ্যের সত্তা নিয়মিত করিতে পারিবে কিরূপে? হেতু পক্ষধর্ম না হইলে তদ্দ্বারা কেবল পক্ষস্বরূপ সেই ধর্মীতেই অনুমিতির ব্যাঘাত ঘটে কিন্তু ব্যাপ্য হেতু অন্যত্র যেখানেই বিদ্যমান সেই ধর্মীতেই উহা সাধ্যের অস্তিত্ব জ্ঞাপনে সমর্থ।

পরামর্শ নামে যে জ্ঞানের পরিচয় পূর্বে দেওয়া হইয়াছে প্রাচীনগ্রন্থে উহা তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ উক্তির অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ অনুমিতিস্থলে প্রথমে হেতুজ্ঞান হইয়া থাকে। তৎপরে 'হেতু সাধ্যের ব্যাপ্য' এই প্রকারে যে ব্যপ্তি স্মরণ হয় তাহা দ্বিতীয়। অনন্তর 'সাধ্য ব্যাপ্য হেতুমান্ পক্ষ' এই প্রকারে যে-পরামর্শ জন্মে তাহা তৃতীয়। উক্তরূপ পরামর্শের পরে 'পক্ষ সাধ্যবান্' এইরূপ বিশিষ্ট জ্ঞানই অনুমিতি। ইহাই অনুমান প্রমাণের ফল।

স্বার্থ ও পরার্থ ভেদে অনুমান দ্বিবিধ। যে অনুমান অনুমাতার স্বীয় ব্যবহার সম্পাদনে উপযোগী তাহা স্বার্থানুমান। যেমন ধূমদর্শনে বহ্নির অনুমান, তুলাদণ্ড দর্শনে পাল্লাস্থিত বস্তুর ভার নিরূপণ, রোগীর অবস্থাদর্শনে রোগনির্ণয় ইত্যাদি। যে অনুমান অপরকে বুঝাইবার জন্য, তাহা পরার্থানুমান। পরার্থানুমানের ক্ষেত্র তর্ক বা বিচার। বিরোধ উপস্থিত হইলে বর্তমান কালে দুই পক্ষ পরস্পর বাক্য বিনিময় করিয়া থাকেন, প্রাচীনকালে ঐরূপ রীতি ছিল না। তখনকার বিচার-প্রথা অনেকটা ইদানীন্তন আদালতে বিচারের মত ছিল। ঐ বিচারে মধ্যস্থ জজের কাজ করিতেন। ধরিয়া লওয়া যাউক স্বর্ণ কোন্ দ্রব্য-বিভাগের অন্তর্গত, ইহা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইল। এইক্ষেত্রে বিচাররীতি এইরূপ—প্রথমে মধ্যস্থ বিচার্য বিষয়ে বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শন করিলেন। বিপ্রতিপত্তি সংশয়। যেমন—স্বর্ণ তৈজস কিনা? তৎপরে একদল 'স্বর্ণ তৈজস' এইরূপে ভাব-কোটি গ্রহণ করিল। অন্যদল গ্রহণ

করিল 'স্বর্ণ তৈজস নহে' এইরূপ অভাব-কোটি। এই স্থলে উভয়দিকেই স্বর্ণ পক্ষ ; তৈজসত্ব এবং তৈজসত্বাভাব যথাক্রমে সাধ্য।

পক্ষ গ্রহণের পরে এক দল অর্থাৎ বাদী 'স্বর্ণ তৈজস' (প্রতিজ্ঞা) কারণ, অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলেও উহার তারল্য নষ্ট হয় না (অর্থাৎ তরলই থাকে ; হেতু) যে যে বস্তু অতিশয় উত্তপ্ত হইলে দ্রবভাব ত্যাগ করিয়া কঠিন হয় তাহা তৈজস নহে, যেমন কর্দম পিত্তল[৭] ইত্যাদি (উদাহরণ, ব্যতিরেকী) স্বর্ণ সেরূপ নহে অর্থাৎ অতিশয় উত্তপ্ত হইলে দ্রবভাব ত্যাগ করিয়া কঠিন হয় না, প্রত্যুত দ্রবই থাকে (উপনয়) 'অতএব স্বর্ণ তৈজস' (নিগমন) এই প্রকারে প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি ন্যায়াবয়ব[৮] বাক্য প্রয়োগ করিয়া মধ্যস্থকে নিজের বক্তব্য বুঝাইয়া দিবেন। মধ্যস্থ বাদিবাক্যের পুনরুচ্চারণ করিবেন। তদ্দ্বারা তিনি বাদীর অভিপ্রায় ঠিক মত বুঝিয়াছেন ইহা প্রমাণিত হইবে। অনন্তর মধ্যস্থের নিকটে বাদীর বক্তব্য বুঝিয়া প্রতিবাদী যথাসম্ভব ছল জাতি এবং নিগ্রহস্থান উল্লেখদ্বারা বাদিবাক্যে দোষ প্রদর্শন করিয়া পূর্ববৎ প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব প্রয়োগপূর্বক মধ্যস্থের নিকটে পূর্বমতের প্রতিবাদ স্বরূপ নিজ মত ব্যক্ত করিবেন। মধ্যস্থ তখন প্রতিবাদীর কথা বাদীকে বুঝাইয়া দিয়া বাদীর ঐ বিষয়ে কিছু বক্তব্য থাকিলে তাহা শুনিবেন। বিবাদক্ষেত্রে এই প্রকার রীতি নির্দিষ্ট থাকায় বাদী ও প্রতিবাদীর পরস্পর বাগ্‌যুদ্ধ নিবন্ধন কোলাহল হইতে পারিত না। বিচারকার্য শৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইত। বিরোধী পক্ষের দোষোদ্ধারে অন্য পক্ষ অসমর্থ হইলে মধ্যস্থ কর্তৃক বিচারের সিদ্ধান্ত ঘোষণায় জয়-পরাজয় সাব্যস্ত হইত।

৭ গলিত পিত্তল জারিত হইলে কঠিনতা পায়।

৮ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন এই পাঁচটি বাক্য যথাক্রমে ও যথানিয়মে উক্ত হইলে ন্যায়-সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। এজন্য প্রতিজ্ঞাদি প্রত্যেকে ন্যায়ের অবয়ব।

প্রাচীন নিয়মানুসারে বিচারকার্য বড়ই কঠিন ছিল। অতি সামান্য কারণে বাদী প্রতিবাদী এমনকি মধ্যস্থও নিগৃহীত হইতেন। মধ্যস্থের কর্তব্য ছিল অতি কঠিন। প্রখর বুদ্ধি, সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞতা, বাক্য-প্রয়োগে নৈপুণ্য, পক্ষপাতশূন্যতা প্রভৃতি বহুগুণ ব্যতীত কেহ মধ্যস্থের গৌরব লাভে অধিকারী হইতেন না।

পুর্বে বলা হইয়াছে, আত্মা সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। কারণ, আত্মতত্ত্বজ্ঞান পরম পুরুষার্থ মুক্তির একমাত্র উপায়। ঐ জন্য জীবাত্মা নিত্য উৎপত্তি বিনাশ রহিত এই সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক। নতুবা, জীবাত্মা অনিত্য হইলে মৃত্যুকালে উহারও বিনাশ হইবে। আত্মার বিনাশ স্বীকার করিলে মুক্ত হইবার মত কোনো কিছুই তো অবশিষ্ট রহিল না। দেহ পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হইল। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যে-টি যে মহাভূত হইতে উৎপন্ন তাহা পুনরায় সেই মহাভূতেই বিলীন হইল। সংসারীদিগের আত্মপ্রত্যয়ের অবলম্বন এই দেহের মধ্যে আর এমন কী জিনিস আছে যাহা পরবর্তীকালে মুক্ত হইতে পারে?

জীবিতাবস্থায় সর্বদুঃখ নিবৃত্তি স্বরূপ মুক্তির সম্ভাবনা চিন্তায়ও স্থান পায় না। মুক্তিশাস্ত্রেও দেহপাতের পরেই নির্বাণমুক্তি সমর্থিত হইয়াছে। অতএব যে পর্যন্ত জীবাত্মার নিত্যত্ব দৃঢ়ভাবে উপপন্ন করা না যাইবে ততক্ষণ কোনো মুক্তিশাস্ত্র সার্থক হইতে পারে না, এবং ঐ উদ্দেশ্যে কোনোরূপ চেষ্টা করাও যুক্তিযুক্ত হয় না। সুতরাং আত্মার নিত্যত্ব স্থাপন করা প্রথম আবশ্যক।

আত্মার নিত্যত্ব প্রমাণিত করিবার জন্য কয়েকটি সাধারণ নিয়ম মানিয়া লইতে হইবে। এইসকল নিয়ম মানিবার পক্ষে যেসমস্ত যুক্তি আছে বাহুল্যভয়ে তাহা এখানে আলোচিত হইবে না।

প্রথম নিয়ম কার্য-কারণভাব। কার্যমাত্রেরই কোনো কারণ আছে,

বিনা কারণে কোনো কার্যই জন্মিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ কার্যের দ্বারা কারণ অনুমিত হইলে উহা দৃষ্টানুসারী হইবে, অর্থাৎ যে জাতীয় কার্য যে প্রকার কারণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া লোকপ্রসিদ্ধ, অনুমিত কারণও যথাসম্ভব তদ্রূপ বলিয়াই স্বীকার্য। তৃতীয়তঃ অনুমিত কারণ যদি গুণজাতীয় পদার্থ হয় তবে তদ্দ্বারা ঐ গুণের আশ্রয় স্বরূপ দ্রব্যেরও অস্তিত্ব মানিতে হইবে। চতুর্থতঃ ঐরূপ দ্রব্যের যদি পূর্বস্বীকৃত দ্রব্যে অন্তর্ভূত হওয়ার পক্ষে বাধা থাকে তবে উহা অতিরিক্ত দ্রব্য হিসাবেই পরিগণিত হইবে।

অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, সংগীত গণিত চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বালকেরা শিক্ষাকালেই এমন আশ্চর্য রকমের নৈপুণ্য প্রকাশ করে যাহা বিশেষ শিক্ষাজনিত সংস্কাব ব্যতীত কখনই সম্ভবে না। যেসব বালক এই জীবনে সেরূপ শিক্ষা পায় নাই তাহাদের ঐ প্রকার সংস্কার কিরূপে আসিল এই প্রশ্নের সমাধান জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিলে অনায়াসে হইতে পারে, নতুবা উহার অন্যপ্রকারে মীমাংসা দুষ্কর। জন্মান্তরবাদী সহসা উহার উত্তরে বলিবেন—'উল্লিখিত বালক, যাহা ইন্দ্রিয়সমন্বিত দেহমাত্র স্বরূপেই দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহা ঐ দেহমাত্রেই পর্যবসিত নহে কিন্তু ঐ দেহের সহিত সম্পর্ক যুক্ত এমন-একটি বস্তু আছে যাহা উহার এই দেহ জন্মিবার পূর্বেও ছিল এবং এই দেহ ভস্মীভূত হইলেও থাকিবে। বালক জন্মিবার পূর্বে ঐ বস্তুটি অন্য-একটি দেহের সহিত বর্তমানের মতই সম্বন্ধযুক্ত ছিল। তখনকার শিক্ষাজনিত সংস্কার বহন করিয়া সেই বস্তুটি এই বর্তমান শরীরে সম্বন্ধ লাভ করিয়াছে। ফলে ঐসব বিদ্যার সম্পর্ক মাত্রেই পূর্বের সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। তাই উহার ঐ সমুদায় বিষয়ে স্মৃতি সকলকে বিস্মিত করিতেছে।' এই সংস্কারের বিশেষ সংজ্ঞা—ভাবনা। ভাবনা-সংস্কার অনুভব জনিত গুণ বিশেষ।

উহা দ্রব্যাশ্রিত। বালকের দেহসৃষ্টির পূর্বে ঐ ভাবনা সংস্কারের অস্তিত্ব মানিতে হওয়ায় দেহকে উহার বাহন কল্পনা করা যায় না। ফলে ঐ সংস্কারের আশ্রয় দেহ ব্যতিরিক্ত দ্রব্য সিদ্ধ হয় এবং তাহাই আত্মা।

যে জন্মেই প্রাক্তন সংস্কার অস্বীকৃত হইবে সেই জন্মেরই অনেক কার্যের যুক্তিসংগত কারণ দুর্লভ হওয়ায় 'কার্যমাত্রই কারণ জন্য' এই এই পূর্বোক্ত নিয়মের ব্যঘাত ঘটিবে। এইভাবে দার্শনিকেরা সৃষ্টি প্রবাহ অনাদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

বর্তমান জন্মের কার্যবিশেষ উপপাদনের জন্য যেরূপ পূর্বজন্মার্জিত সংস্কার স্বীকার করিতে হয় সেইরূপ পূর্বজন্মের অনেক কার্য তৎপূর্ববর্তী অন্য জন্মান্তরে সঞ্চিত সংস্কার ব্যতীত উপপন্ন হয় না বলিয়া পূর্বতর জন্মও স্বীকার্য। সদ্যোজাত শিশুর মাতৃস্তন্যাভিলাষ হর্ষ ভয় দুঃখ প্রভৃতি যে প্রাক্তন সংস্কারবশতই সম্ভব হয় ন্যায়সূত্রে তাহা বিশেষ ভাবে সমর্থিত হইয়াছে। এইরূপে উত্তরোত্তর জন্মসমূহের কার্য সমুদায় পূর্ব-পূর্ব জন্মের সংস্কারসাপেক্ষ হওয়ায় জন্ম সংস্কার প্রবাহের এবং উহার আশ্রয়স্বরূপ আত্মার অনাদিত্ব মানিতে হয়। আত্মা অনাদি হইলে তাহার বিনাশও নাই ইহাও স্বীকার করিতে হয়। কারণ, যে ভাবপদার্থ অনাদি-উৎপত্তিশূন্য, তাহা অবিনাশী ইহা অনুমান প্রমাণসিদ্ধ। আত্মা নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশ রহিত হইলে মৃত্যুর পরে শরীর ভস্মীভূত হইলেও চিরস্থায়ী ঐ বস্তু বিদ্যমান থাকায় মুক্তি কাহার হইবে এই প্রশ্নের আর অবকাশ থাকে না।

শাস্ত্র আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায়, কিন্তু ঐ জন্য ঈশ্বরোপাসনাও আবশ্যক। উপাস্যের স্বরূপ না জানিলে উপাসনা করা যায় না। তাই ঈশ্বরের স্বরূপ অবগতির জন্য ঐ বিষয়ে প্রমাণ পর্যালোচনা প্রয়োজন। ঈশ্বর প্রত্যক্ষযোগ্য হইলে তাঁহার অস্তিত্ব লইয়া চিরকাল বিবাদ চলিয়া

আসিত না। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণ বাদ দিয়া ঐ বিষয়ে আর কি প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাই দেখিতে হইবে। অনুমান প্রমাণ দ্বারা পক্ষরূপ ধর্মীতে সাধ্য-ধর্ম নিশ্চিত হয়। কিন্তু ঈশ্বর-স্বরূপ ধর্মী বা পক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ না হইলে ঐ বিষয়ে অনুমানও অচল। অতএব ধূমদর্শনে পর্বতে বহ্ন্যনুমানের ন্যায় অনুমান দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধি সরলভাবে সম্পন্ন করা যায় না। এ-জন্য প্রকারান্তরের অনুসরণ করিতে হইবে।

ঈশ্বরানুমানে প্রসিদ্ধ প্রয়োগ এইরূপ—

পার্থিব দ্ব্যণুক (পক্ষ) পার্থিব পরমাণু বিষয়ক প্রত্যক্ষ জনিত (—প্রত্যক্ষ জন্যত্ব সাধ্য) যে-হেতু উহা (পার্থিব দ্ব্যণুক) উৎপন্ন বস্তু (কার্যত্ব হেতু)[৯]। দেখিতে পাওয়া যায় যে ব্যক্তি যে দ্রব্যের উৎপাদক সে ঐ দ্রব্যের উপাদান সমূহ প্রত্যক্ষভাবে অবগত হইয়া উহার নির্মাণে ব্যাপৃত হয়। সূত্র বস্ত্রের উপাদান। তন্তুবায় সূত্রগুলি প্রত্যক্ষতঃ দেখিতে পায় বলিয়াই ঐগুলি যথারীতি সাজাইয়া বস্ত্র নির্মাণে সমর্থ হয়। সূত্রগুলি উহার অপ্রত্যক্ষ হইলে সে বস্ত্র নির্মাণ করিতে পারিত কি? আরও দেখা যায়, কুম্ভকার কলসী তৈয়ার করে। কলসীর উপাদান—মৃত্তিকা—কপাল-কপালিকা। উহা কুম্ভকারের প্রত্যক্ষ বিষয়। তাই কুম্ভকার উহাদের যথাযথ সংযোগ ঘটাইয়া কলসী প্রস্তুত করিতে পারে।

এইপ্রকার বহু দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝা যায় যে, যে দ্রব্য উৎপত্তি যোগ্য স্ব স্ব উপাদানের প্রত্যক্ষ হইতেই তাহার উৎপত্তি হয়। অতএব কার্যত্ব-হেতু উপাদানপ্রত্যক্ষজন্যত্ব-সাধ্যের ব্যাপ্য। পরামাণু হইতে দ্ব্যণুক এবং দ্ব্যণুক হইতে ত্র্যণুক কিপ্রকারে জন্মে সৃষ্টি প্রকরণে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং পরমাণুপ্রত্যক্ষজন্যত্ব-সাধ্যের ব্যাপ্য কার্যত্ব-হেতু দ্ব্যণুকে সিদ্ধ হয়। প্রকৃতস্থলে ঐ জ্ঞানই পরামর্শ। অতঃপর দ্ব্যণুক পরমাণুবিষয়ক প্রত্যক্ষ হইতে উৎপন্ন এইপ্রকার

---

৯ পার্থিব দ্ব্যণুকং পার্থিব পরমাণু প্রত্যক্ষ জন্যং কার্যত্বাৎ।

অনুমিতির পক্ষে কোনো বাধা না থাকায় দ্ব্যণুকে প্রত্যক্ষজন্যত্ব স্বরূপ সাধ্য নিশ্চিত হয়।

উক্ত প্রকার অনুমান দ্বারা দ্ব্যণুকে পরমাণুপ্রত্যক্ষজন্যত্ব সিদ্ধ হইল বটে কিন্তু উহাতে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব কিরূপে সমর্থিত হয় এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয় ইতরবাধ বশতই উহাদ্বারা, ঈশ্বরাস্তিত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। কারণ, কোনো জীবাত্মাই পরমাণু প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ নহে, অথচ অনুমানবলে সিদ্ধ পরমাণু বিষয়কপ্রত্যক্ষ অস্বীকারেরও উপায় নাই। পরমাণুপ্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইলেই জ্ঞানবিশেষ স্বরূপ ঐ প্রত্যক্ষ কোনো আত্মার ধর্ম ইহা মানিতে হয়। যে হেতু, জ্ঞান গুণপদার্থ, আশ্রয় ব্যতিরেকে তিষ্ঠিতে পারে না। অতএব কোনো জীবাত্মা ঐ প্রকার প্রত্যক্ষের আশ্রয় না হওয়ায় সমস্ত জীবাত্মা হইতে পৃথক যে আত্মা উহার আশ্রয় রূপে সিদ্ধ হয় তিনিই ঈশ্বর।

দ্ব্যণুকাদি সূক্ষ্ম বস্তুর ন্যায় বিচিত্র বিশাল এই পৃথিবী, সূর্য চন্দ্র সমুদ্র পর্বত প্রভৃতি বিরাট বস্তু সমূহের সৃষ্টিও পরমেশ্বর স্বীকার ব্যতীত উপপন্ন হয় না।

কার্যত্ব হেতুর ন্যায় আয়োজন অর্থাৎ দ্ব্যণুক সৃষ্টির নিমিত্ত পরমাণুর ক্রিয়া, ধৃতি বিনাশ লোকব্যবহার প্রভৃতি আরও অনেক হেতুর দ্বারা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অনুমিত হইতে পারে। মহামতি উদয়নাচার্য কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে নিপুণভাবে উহা উপপাদন করিয়াছেন। কুতূহলী পাঠক তাহা পাঠ করিলে তৃপ্ত হইবেন।